আনোয়ারা

মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

আলোকিত মানুষ চাই

আনোয়ারা

মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

সম্পাদনা ও ভূমিকা

মমতাজউদদীন আহমদ

অনুপম সংস্করণ

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৯১

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
ফাল্গুন ১৩৯৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

চতুর্থ সংস্করণ চতুর্থ মুদ্রণ
ভাদ্র ১৪২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
ফোন : ৯৬৬০৮১২ ৫৮৬১২৩৭৪, মোবা. ০১৮৩৯৯০৬৭৫৪

মুদ্রণ
কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা রোড, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
মাসুক হেলাল

মূল্য
একশত ত্রিশ টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0090-X

ANOARA
A novel by Mohammad Najibar Rahman Shahittaratna
Edited and introduction by Momtajuddin Ahmed
Published by Bishwo Shahitto Kendro
17 Mymensing Road, Banglamotor, Dhaka 1000 Bangladesh

Email : bskprokashona@gmail.com www.bsksale.com

Price : Tk. 130.00 only

ভূমিকা

মোহাম্মদ নজিবর রহমানের বহুলপঠিত প্রায় কিংবদন্তি সমতুল *আনোয়ারা* একখানি বর্ণনামূলক দীর্ঘ উপন্যাস। পরিচয় অংশ ও উপসংহারসহ মোট পাঁচটি পর্বে ছেষট্টিটি পরিচ্ছেদে ব্যাপ্ত *আনোয়ারা* । ১৯১৪ সালে প্রথম প্রকাশিত *আনোয়ারা* –র পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় চারশ।

প্রথমদিনও *আনোয়ারা* –র যেমন বিপুল পাঠক ছিল আজকেও *আনোয়ারা* –র কাহিনীর জন্য পাঠকের সমান আগ্রহ। তবে এখনকার পাঠক বিস্তৃত ও বর্ণনামূলক উপন্যাস অপেক্ষা বিশ্লেষণধর্মী এবং স্বল্প শাখাপ্রশাখা সমন্বিত কথার প্রতি অধিক মনোযোগী। আশি বছর আগের বাংলা উপন্যাসপাঠকের সঙ্গে আজকের পাঠকের বিস্তর ব্যবধান ঘটে গেছে।

উপন্যাসের প্রতি সেদিনের পাঠকের স্বাভাবিক আগ্রহ আর এখনকার পাঠকের মনোযোগের কথা বিবেচনা করে *আনোয়ারা* উপন্যাসের একটি আধুনিক ও অনুপম সংস্করণ করার ইচ্ছা আমার বহুকালের। তারই ফলে এখনকার সংক্ষেপিত আনোয়ারা। এ অনুপম সংস্করণকে উপসংহারসহ চারটি পর্বে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট তেতাল্লিশটি পরিচ্ছেদে সজ্জিত করা হয়েছে। এতে আধুনিক বাংলা বানান পদ্ধতি অনুসরণ এবং বাড়তি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আলাদা করে প্রত্যেক পরিচ্ছেদের নামকরণও করা হয়েছে। তবে আনোয়ারার মূল ভাষাশৈলী ও বাক্যপ্রকরণকে কোনোভাবে ভাঙা হয়নি।

এ সংস্করণে বর্তমানকালে অপরিচিত ও অব্যবহৃত কিছু কিছু শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ১৩৫২ সনের (১৯৪৫ সাল) উনবিংশ মুদ্রণ অবলম্বনে এ সংস্করণটির কাজ হয়েছে। এ অনুপম সংস্করণ পাঠ করে উৎসাহী পাঠক যদি পূর্ণতর *আনোয়ারা* উপন্যাসখানির সন্ধান করে তাহলে আমরা খুশি হব।

আনোয়ারা উপন্যাসের অনুপম সংস্করণ প্রস্তুত করার জন্য আমার সঙ্গে কাজ করেছেন কামাল আহমেদ, আশরাফ আলী, আহমাদ মাযহার ও আমীরুল ইসলাম। তাঁদের হিতকর সহযোগ ও সাহায্য ছাড়া আমি এ সংস্করণ করার উৎসাহ ধরে রাখতে পারতাম না। আমার সহধর্মিণী কামরুননেসা মমতাজ *আনোয়ারা* উপন্যাসের সামাজিক বিশ্লেষণ ও আগ্রহ বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ পরামর্শ দিয়ে বাধিত করেছেন।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সৎসাহিত্য প্রকাশনা কর্মসূচির মধ্যে *আনোয়ারা* –কে অন্তর্ভুক্ত করে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। শিল্পী হাশেম খান *আনোয়ারার* ছবিগুলো যত্ন নিয়ে এঁকে দিয়ে প্রকাশনাকে শোভন করে দিয়েছেন। আমি সকলের কাছে আন্তরিকভাবে প্রীতিবদ্দি।

ঢাকা
২১ ফেব্রুয়ারি '৯২

মমতাজউদদীন আহমদ

১. নজিবর রহমান প্রসঙ্গ

আনোয়ারা একটি স্নিগ্ধ সরল এবং জীবনমুখী উপন্যাস। এর রচয়িতা মোহাম্মদ নজিবর রহমান মুসলিম বাঙালির কাছে অতিপ্রিয় নাম। বাংলা কথাসাহিত্য ইতিহাসে নজিবর রহমানের নাম অবিস্মরণীয়।

১৮৫২ সালে পাবনা জেলার শাহজাদপুরের নিকটে বেলতৈল গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। একটি নিচু বিলের পাশে অবস্থিত এই গ্রামের অদূরে নদী প্রবাহিত। গণ্ডগ্রামের অধিবাসী হলেও তিনি ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত হন। মোহাম্মদ নজিবর রহমান নিজ গ্রামে পণ্ডিতসাহেব নামে সুপরিচিত ছিলেন। লেখক হিসেবে খ্যাতি লাভের পর তাঁকে 'সাহিত্যরত্ন' খেতাবে ভূষিত করা হয়।

মোহাম্মদ নজিবর রহমানের জন্ম এবং মৃত্যুসন নিয়ে পণ্ডিতমহলে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। তবে সব মতের মধ্যে মোহাম্মদ মতিউর রহমানের সিদ্ধান্ত অনেকখানি নির্ভরযোগ্য। কেননা, মোহাম্মদ মতিউর রহমান লেখকের জীবনতথ্য সন্ধানের জন্য সরেজমিনে লেখকের লোকালয়ে গিয়েছেন, স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন এবং বহুবিধ তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সে হিসেবে মোহাম্মদ নজিবর রহমানের জন্মসন ১৮৫২ এবং মৃত্যুসন ১৯২৫। নজিবর রহমান দীর্ঘ ৭৩ বৎসর বেঁচে ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ জয়েনউদ্দীন সরকার, মায়ের নাম হালিমুন্নেছা। তাঁরা কৃষিজীবী ছিলেন। চাচা মোহাম্মদ জয়েদউদ্দীন আহমদ নজিবর রহমানের শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেন। চাচা জয়েদউদ্দীন মসজিদের ইমাম ছিলেন। তাছাড়া সাহিত্যরসিকও ছিলেন, সুর করে পুঁথি পাঠ করতেন। তিনিই নজিবর রহমানকে সাহিত্যসাধনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

নজিবর রহমানের পূর্বপুরুষ বাংলাদেশের তৎকালীন রাজধানী মুর্শিদাবাদের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর জনৈক পূর্বপুরুষ মুর্শিদাবাদের নবাবের স্টেট-ম্যানেজার ছিলেন। তিনি নবাব-পরিবারের এক বিধবা মহিলাকে বিবাহ করেন। তাঁরা পরে পাবনা জেলার মালতিডাঙা গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। এখানে মির্জা উপাধির স্থলে তাঁরা সরকার উপাধিতে পরিচিত হলেন। একসময় মালতিডাঙা গ্রাম ছেড়ে তাঁরা বাতিয়া গ্রামে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তী বংশধর জয়েনউদ্দীন সরকার শাহজাদপুর থানার অধীন বেলতৈল গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

মোহাম্মদ নজিবর রহমান শাহজাদপুর বিদ্যালয় থেকে ছাত্রবৃত্তি পাস করে ঢাকা নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন। এ বিদ্যালয়ে তিনি মুসলমান সমাজের ধ্যানধারণা ও কর্মপন্থা সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হন। নর্মাল পরীক্ষায় পাস করে জলপাইগুড়িতে একটি চাকরির সংস্থান করেন। কিন্তু বিশেষ কারণে ছয় মাস পর এ চাকরিতে ইস্তফা দেন। এরপর ভাঙাবাড়ি মধ্য ইংরেজি স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। এখানেই তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় কাটে। ভাঙাবাড়িতে প্রখ্যাত কবি রজনীকান্ত সেনের সাহচর্যে এসে তাঁর সাহিত্যমানস বিকশিত হয়। তিনি সমাজসংস্কারমূলক বিভিন্ন কাজে ব্রতী হন। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ও সুপ্রসিদ্ধ

বাগ্মী সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা লাভ করেন নজিবর রহমান। পরে তিনি সলঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি গ্রহণ করেন। এখানে একবার দুর্দশায় পড়েছিলেন। সলঙ্গা ত্যাগ করে তিন মাইল দূরবর্তী হাটিকুমরুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। একসময় তিনি রাজশাহী গুরু ট্রেনিং বিদ্যালয়ে চাকরি করেন। রাজশাহীতে জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসেন। এখানেই মুসলিম সমাজের আদর্শ সমন্বিত পুস্তকাদি লেখার প্রয়োজনীয়তা মনেপ্রাণে অনুভব করেন। নর্মাল স্কুলের শিক্ষক হিসেবে রাজশাহীতে অবস্থানকালেই তিনি তাঁর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং বিখ্যাত গ্রন্থ *আনোয়ারা* উপন্যাসটি রচনা করেন।

অর্থাভাবে *আনোয়ারা* প্রকাশিত হচ্ছিল না। রাজশাহী কলেজ ও রাজশাহী জুনিয়র মাদ্রাসার মুসলমান ছাত্রবৃন্দ লেখককে *আনোয়ারা* মুদ্রণের জন্য তিনশ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। তিনি তামাকের ফটকা ব্যবসায় ভাগ্যক্রমে সাতশ টাকা লাভ করেন। সর্বমোট এক হাজার টাকা তিনি মখদুমী লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী খানবাহাদুর মোবারক আলীকে প্রদান করেন। এভাবেই বাংলাসাহিত্যের অন্যতম সর্বাধিক জনপ্রিয়, মুসলিম জীবনবোধসম্পন্ন এবং সামাজিক ও পারিবারিক চিত্রসংবলিত *আনোয়ারা* উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয়।

সমাজসচেতন নজিবর রহমান শেষজীবনে একটি কঠিন আঘাত পান। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজশাহী কলেজে বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার পর হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন। যুবকপুত্রের মৃত্যুতে নজিবর রহমান একেবারে ভেঙে পড়েন। বৃহৎ সংসারে তাঁর ব্যয়ও ছিল বেশি। তিনি দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। রোগভোগের পর ১৯২৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন সাহিত্যরত্ন মোহাম্মদ নজিবর রহমান।

নজিবর রহমান সমাজদরদী ও কর্মকুশলী ছিলেন। মুসলিমসমাজের ব্যথা-বেদনা গভীরভাবে অনুভব করতেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের স্পন্দন অনুভব করেছিলেন। 'বিলাতি বর্জন রহস্য' নামে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক পুস্তিকা (১ম সংস্করণ ১৩১১ সন) বের করেন। এই পুস্তিকায় মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কথা তুলে ধরেছিলেন। পুস্তিকাটি ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। অপ্রিয় সত্যকথা লিখিত হয় বলে ইংরেজ সরকার পুস্তিকাটি বাজেয়াপ্ত করেছিল।

সামাজিক আন্দোলনের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল গভীর। শিক্ষাপ্রচারে ছিল অক্লান্ত সাধনা। শিক্ষাপ্রসারের জন্য তিনি চর বেলতৈল, সলঙ্গা, হাটিকুমরুল প্রভৃতি অঞ্চলে দিবা ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেকালের মুসলমান সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রধান চিন্তাই ছিল মুসলমান সমাজে ধর্মীয় জাগরণ আনয়ন করা। মুসলিম চিন্তাবিদগণ সভা-সমিতি ও পুস্তক রচনা এবং সংবাদপত্র প্রচার করে আত্মবিস্মৃত মুসলমান সমাজে জাগরণ সঞ্চারিত করেছেন। নজিবর রহমান এই আন্দোলনে দলভুক্ত ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে মুসলিম সমাজে অনেক গুণী সাহিত্যিকের জন্ম হয়। মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮–১৯১২), মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন আহমদ (১৮৬০–১৯৩৩), মুনশী মুহম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১–১৯০৭), আবদুল জব্বার (১৮৮১–১৯১৮), মুহম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৬–১৯৩৮), শেখ আবদুর রহীম (১৮৫৯–১৯৩১), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০–১৯৩১), মোজাম্মেল হক (১৮৬১–১৯৩৬) প্রমুখ সাহিত্যসাধকের সঙ্গে নজিবর রহমান তাঁর সাহিত্যসাধনার ধারাকে সংযুক্ত করেছেন। মীর মশাররফ হোসেন উচ্চস্তরের

মুসলমান সমাজের শিল্পিত চিত্র অঙ্কন করেছেন। কাজী ইমদাদুল হক অভিজাত মুসলমান সমাজের চিত্র অসামান্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন।

নজিবর রহমান মুসলমান সমাজের ত্রুটি, পারিবারিক কোন্দল, অর্থনৈতিক অসারতা এবং মিথ্যা আভিজাত্যবোধ—যা আমাদের সমাজদেহকে ক্ষতবিক্ষত করেছে— সেসব কাহিনী অতি সরল ও সহজভাবে তাঁর উপন্যাসসমূহে চিত্রায়িত করেছেন। মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন রচিত উপন্যাসের সংখ্যা ছয়টি—

১. *আনোয়ারা* ২. *প্রেমের সমাধি* ৩. *পরিণাম* ৪. *গরীবের মেয়ে*
৫. *দুনিয়া আর চাই না* ৬. *হাসান গঙ্গা বাহমনী*

নজিবর রহমানের শ্রেষ্ঠ রচনা *আনোয়ারা* । বাংলা ভাষায় রচিত অনেক উপন্যাসের মধ্যে *আনোয়ারা*-র জনপ্রিয়তা তুলনারহিত। যেমন সেকালে তেমন বর্তমানকালেও এ উপন্যাসটি মুসলিম বাঙালির ঘরে ঘরে পঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে এ-গ্রন্থটির ২৩ তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তখনই এ বই-এর দেড় লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে। এতদিনে এ বইটির আরো এক লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে বলে অনুমান করা যেতে পারে। যে সরলতা এবং আদর্শমণ্ডিত জীবনবোধসমৃদ্ধ রচনার গুণে নজিবর রহমানের আনোয়ারা পাঠকের চিত্ত মুগ্ধ করেছে, তাঁর অন্যান্য রচনা অবশ্য তেমন নির্মল ও সরলতার গুণে গুণান্বিত নয়।

গ্রামবাংলার এক নিভৃত জীবনের মধ্যে বসবাসকারী নজিবর রহমান জীবনকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন। *আনোয়ারা* এবং অন্যান্য গ্রন্থে তাঁর সেই ভালোবাসা বিস্তৃত হয়ে আছে। বিশেষত পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজজীবনের জন্য স্নেহার্দ্র এই সহজাত গদ্যলেখক এবং কথাশিল্পীর অবদান বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। *আনোয়ারা* উপন্যাস সম্পর্কে মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছেন :

> সমাজের শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজন, বহু বিবাহের কুফল, স্ত্রৈণতার দোষ, স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর সমঝোতা, কুলগর্বের অন্তঃসারশূন্যতা, চাকুরি জীবনের বিড়ম্বনা, স্বাধীন ব্যবসায়ের সুখ, গ্রাম্য দলাদলি, স্বার্থান্ধের হিতাহিতজ্ঞানশূন্যতা, গুণ্ডা বদমাইশের ষড়যন্ত্র, প্রকৃত সতীত্বের গৌরব আর ধর্মজীবনের মাহাত্ম্য প্রভৃতি গ্রন্থকার যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, সাধারণ মুসলমানের কাছে তার আবেদন আকর্ষণীয়। আনোয়ারা ও নুরল এসলাম মুসলিম গ্রামীণ সমাজের টাইপ চরিত্র। এ সমাজের নরনারীর এমন টিপিক্যাল চরিত্র নজিবর রহমানের মতো আজো কেউ চিত্রিত করতে পারেননি। এ কারণেই সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত এত অধিকসংখ্যক লোক এত আগ্রহের সঙ্গে এ বইটির রসোপলব্ধি করে থাকে।

২. উপন্যাস প্রসঙ্গ

উপন্যাস শব্দটির বাংলা অর্থ আখ্যায়িকা অথবা গল্প। সংস্কৃত শব্দানুসারে উপন্যাসকে ভেঙে দেখালে হয়—(উপ + নি + অস্ + অ)—অর্থাৎ কোনো গল্প বা কাহিনী উপস্থাপন। উপন্যাস শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ নভেল। যার মানে হল, নতুন অথবা আশ্চর্যজনক কিছু অর্থাৎ কল্পনা দিয়ে জীবনের কাহিনী রচনা করা। বাংলা, সংস্কৃত বা ইংরেজি সকল ভাষাতেই উপন্যাসের অর্থ হল কাহিনী বা গল্প। সে গল্প মানবজীবনের। যখন কোনো কাহিনীর মাধ্যমে মানবজীবনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সত্যকে উপযুক্ত ভাষায় রসময় এবং

কৌতূহলোদ্দীপক করে রচনা করা হয় তখন তাকে উপন্যাস বলে। উপন্যাস রচনার জন্য বেশি প্রয়োজন একটি কাহিনীর। সে কাহিনী বিভিন্ন সূত্র থেকে লেখক আহরণ করেন। তিনি যে বর্তমানকালে বাস করছেন, যে পরিমণ্ডলে বাস করছেন অথবা ইতিহাসের ঘটনা এবং জীবনের দর্শন থেকে কাহিনী নিয়ে তাকে নিজের প্রয়োজনমতো বিন্যাস করেন। কাহিনীকে প্রকাশ করার জন্য দরকার অনেক চরিত্রের। কাহিনীর বিকাশ এবং কাহিনীর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চরিত্র রচিত হয়— দরকার হয় পরিবেশ রচনার। যে পরিবেশ এবং আবহের মধ্যে ঘটনাটা ঘটছে বা ঘটেছে তার প্রতিচ্ছবি আঁকতে হয় লেখককে। আঁকার কাজটি হবে ভাষার মাধ্যমে। উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র ও পরিবেশকে পূর্ণভাবে বিকাশ করার মাধ্যম হল ভাষা। সেজন্য উপন্যাসের ভাষা সম্পর্কে লেখককে খুব সাবধান ও সচেতন থাকতে হয়। উপন্যাস তো নাটক নয় যে তার রূপ মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে দেখা যাবে। উপন্যাস এককভাবে পড়ে পাঠক। পাঠের মাধ্যমে উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনী, চরিত্র ও পরিবেশ উপলব্ধি করে নেয়। পাঠকের আকর্ষণ সঞ্চার করার জন্য লেখককে বিচিত্র আয়োজন করতে হয়। তাই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান শক্তি তার বর্ণনার ভাষা ও সৌন্দর্য। বড় মাপের লেখক তাঁর উপন্যাসে বর্ণনা ও সৌন্দর্যকে সর্বদা সজীব করে রাখেন।

৩. বাংলা উপন্যাস প্রসঙ্গ

বাংলাসাহিত্যে উপন্যাস রচনা শুরু হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে। কিন্তু বহুপূর্বেই আমাদের মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যে কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে। *রামায়ণ–মহাভারতের* কাহিনী, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের কাহিনী, জঙ্গনামায় কারবালার কাহিনী, লায়লী–মজনুর কাহিনী, পদ্মাবতীর কাহিনী, মহুয়া–মলুয়ার কাহিনী। সবই কাব্যকাহিনীর বিষয়। এসব কাহিনীতে মানব–মানবীর কথা, মানব–সমাজের কথা, দেবতার কথা আছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর মধ্যে সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের অনটন ও জীবনসংগ্রামের কথা প্রধান বিষয়। এ সমস্ত কাহিনীর মধ্যেই উপন্যাসের কিছু কিছু লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে মুদ্রণযন্ত্র চালু হল। শুরু হল গদ্যে সাহিত্যরচনার কাজ। নিয়মিতভাবে সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হল। মানুষের নিত্যদিনের ছোট–বড় তথ্য, জীবনজিজ্ঞাসা ও সমাজের বিচিত্র খবর গদ্যের সম্ভারে লিখিত হল সংবাদপত্র এবং নকশা–জাতীয় রচনায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলাবিভাগের উদ্যোগে বাংলাগদ্যের প্রস্তুতিপর্বের শুরু। বাংলাগদ্য রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার গুণে নিজস্ব শক্তি অর্জন করল। গদ্য রীতিতে আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ উপন্যাস বাংলাসাহিত্যে স্থান লাভ করল। প্যারীচাঁদ মিত্র রচনা করলেন *আলালের ঘরের দুলাল* ১৮৫৮ সালে। গ্রন্থটি পুরোপুরি অর্থে সার্থক উপন্যাস নয়। যে রহস্যঘন এবং সূক্ষ্ম বিচার–বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপন্যাসে মানব–চরিত্র এবং জীবন অঙ্কিত হয়, সেই সূক্ষ্ম জীবনবোধের কাজ নেই *আলালের ঘরের দুলাল* উপন্যাসে। তবু তৎকালীন সমাজের ভালো–মন্দ মানুষ, বিচিত্র ঘটনা এবং অসংখ্য চরিত্রের সমাহারে *আলালের ঘরের দুলাল* সমৃদ্ধ হয়ে আছে।

বাংলা উপন্যাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজটি করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। চৌদ্দখানি উপন্যাস রচনা করেছেন তিনি। তাঁর উপন্যাসে ইতিহাস, ধর্ম ও সমাজ অতি নিপুণভাবে অঙ্কিত

হয়েছে। তাঁর রচনায় সবচেয়ে বেশি আছে মানবমনের বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য বিশ্লেষণ। হৃদয়রাজ্যের গভীরে প্রবেশ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। নরনারীর জীবনবোধ, ধর্মবোধ, সামাজিক অবস্থান এবং সর্বোপরি তাদের প্রেম-বিরহের গতিপ্রকৃতি তাঁর উপন্যাসে বিশিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ। বঙ্কিমের উপন্যাসের সক্ষম ঐশ্বর্য লাভ করে বাংলা উপন্যাস বাল্যদশা থেকে একলাফে যৌবনপ্রাপ্ত হল। তাঁর *দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের সংখ্যা ১২টি। ইতিহাস, সমাজ, দর্শন, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ব্যক্তিমানুষের মনের দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক অবস্থানের সংঘাত অসাধারণ আলোকোজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। *নৌকাডুবি, চোখের বালি, গোরা, শেষের কবিতা, যোগাযোগ* তাঁর উপন্যাস।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জনপ্রিয়তার গুণে আজো সর্বাধিক পঠিত ঔপন্যাসিক। শরৎচন্দ্র সামাজিক সংস্কার ও লোকাচারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিমানুষের অবস্থানগত সংকটকে অতি মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে অঙ্কন করেছেন। মানুষ অপেক্ষা সমাজ বড় নয়, হৃদয় অপেক্ষা সংস্কার বড় নয়—শরৎচন্দ্র বারংবার এ-কথাগুলো বলেছেন। *বিরাজবৌ, পল্লীসমাজ, শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, গৃহদাহ* তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বাঙালি জীবনে এবং বাংলাসাহিত্যে বিস্ময় সংকটের দোলা এসে লাগল। বাংলার সাহিত্য দেশজ সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বসাহিত্যের অভিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে শুরু করল। বিশ্বময় ঘোষিত জীবনদর্শন ও অর্থনৈতিক জিজ্ঞাসা সাহিত্যে সংশ্লিষ্ট হতে লাগল। গতানুগতিক জীবনের মূল্যবোধ আর নয়—তখন থেকে মানুষের যোগ্যতা, শ্রম এবং সংগ্রামের মূল্য যাচাই হতে শুরু হল। এভাবে বাংলা উপন্যাসে নতুন জীবনবোধ এল। নতুন ভাবনা, নতুন চিন্তা ও জিজ্ঞাসায় আমাদের উপন্যাস উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এ পর্যায়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতি লেখকের উপন্যাস বাংলাসাহিত্যকে বিস্তৃতি দান ও বিচিত্রমুখী করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দেশবিভাগ ইত্যাদি কারণে বাঙালির চিন্তা-চেতনায় নব নব মাত্রা যুক্ত হল। অর্থনৈতিক সংকটের চরম অবস্থা, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িকতা, নীচতা, ক্ষুদ্রতা, মধ্যবিত্ত লোকমানসের বিভ্রান্তি প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় আমাদের উপন্যাসকে ক্রমে বহুমাত্রিকতা দান করল।

৪. উপন্যাসে মুসলিম জীবন প্রসঙ্গ

দেশভাগের পর পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে, মানে পূর্ববাংলায় ঔপন্যাসিকদের কাছে নতুন দায়িত্ব এল। কলকাতাকেন্দ্রিক মুসলিম লেখকদের সাহিত্যের ঐতিহ্য যেমন তাঁরা গ্রহণ করলেন, তেমনি নতুন এক দেশ ও আধুনিককালের মানুষের সংকট ও জীবনবোধকে উপন্যাসের বিষয় করলেন। তার সঙ্গে যুক্ত হল পূর্ববাংলার নিজস্ব জীবনবোধ, ভাষার শৈলী এবং শব্দভান্ডারের অভিনবত্ব।

মীর মশাররফ হোসেনের *বিষাদ-সিন্ধু* বা *উদাসীন পথিকের মনের কথার* সূত্র ধরে ধীরে ধীরে বাংলার মুসলমান লেখকরা এগিয়ে এসেছেন। নজিবর রহমান, মোজাম্মেল হক, কাজী

এমদাদুল হক, কাজী নজরুল ইসলাম, মাহবুব উল আলম, আবুল ফজল, আবু রুশ্‌দ, শওকত ওসমান প্রভৃতি লেখক রচনা করলেন মুসলিম জীবনবাদী উপন্যাস। তাঁদের রচনায় অনিবার্য কারণে বাংলার মুসলমানদের জীবন, সমাজ, লোকাচার ও ধর্মীয় চেতনা প্রাধান্য পেয়েছে। সে সঙ্গে মুসলিম সমাজজীবনের আদর্শমণ্ডিত একটি স্বপ্নময় সমাজগঠনের ইচ্ছাও ফুটে উঠেছে। উপন্যাস রচনায় মুসলমান লেখকবৃন্দ বঙ্কিমচন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাবান কেউ ছিলেন না। কিন্তু নিজ পরিমণ্ডল ও জীবনপ্রবাহকে সচেতনভাবে অঙ্কন করে বাংলাসাহিত্যে উপন্যাসের প্রান্তরকে তাঁরা অনেক বড় করলেন। উপন্যাসের ভূমিকা বড় হল। ভাষা ও বাক্যশৈলী জীবনসংলগ্ন হল এবং সর্বোপরি বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলমান সম্প্রদায়ের কাহিনী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হল।

এই কাজটি সমানভাবে আজো করে চলেছেন আমাদের একালের ঔপন্যাসিকবৃন্দ। শামসুদ্দীন আবুল কালাম, সৈয়দ শামসুল হক, রাবেয়া খাতুন, শওকত আলী, সেলিনা হোসেন, আখতারউজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখ রচনাকারের নিষ্ঠাময় সাহিত্যকর্মে আমাদের উপন্যাস–সাহিত্য প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে।

৫. আনোয়ারা প্রসঙ্গ

আনোয়ারা উপন্যাসটি বাঙালি মুসলমান পারিবারিক জীবনধারা অবলম্বনে একটি সরল ও স্নিগ্ধ কাহিনী। উপন্যাসটির সারল্য অতি সুন্দর। আদর্শ জীবনবোধের চিত্র হিসেবে এ–গ্রন্থ ত্বরিতেই বাঙালি মুসলমানদের প্রীতিধন্য হয়। *আনোয়ারা* সর্বাধিক পাঠক–পাঠিকা কর্তৃক আদৃত একটি জনপ্রিয় উপন্যাস। দীর্ঘ আশি বছরব্যাপী সমভাবে জনপ্রিয়তা এ উপন্যাসের অন্যতম সেরা গুণ। কিন্তু জনপ্রিয়তা সাহিত্যবিচারের জন্য সবসময় নিরাপদ নয়। একসময়ের অতি জনপ্রিয় বস্তু পরবর্তীকালে অনাদৃত এবং অপাঙক্তেয় হয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু *আনোয়ারা* উপন্যাসের জনপ্রিয়তার কারণ সস্তা বা হালকা আবেদন নয়। এ উপন্যাসটিতে মুসলিম বাঙালি জীবনের চিত্র অতি সততা এবং সরলতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। ঘটনাগুলোর সম্ভাব্য সত্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে কারো মনে সন্দেহ জাগে না। এ উপন্যাসে সমাজ এবং পরিবারে মানবমানবীর বিচিত্র চরিত্র অতি নিকট থেকে দেখে তাদের আচরণ ও প্রকৃতির স্বরূপ উদঘাটন করা হয়েছে। চরিত্রগুলো সকলের পরিচিত। তাদের ভালো অথবা মন্দবোধগুলো কারো অজানা নয়। চরিত্রগুলোর ভালোমন্দের পরিচয় সরলভাবে বিছিয়ে রাখা হয়েছে।

মধুপুর গ্রামে যেমন অসংখ্য ভালোমানুষ আছে—যারা স্নেহ, মায়া, মমতা ও পরোপকারের জন্য উদারচিত্ত মানুষ—তেমনি এ জনপদে হিংসা, দ্বেষ ও নীচপ্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষেরও অভাব নেই। ভালো ও মন্দ হওয়ার পেছনে যে–সমস্ত জটিল কারণ থাকে, লেখক সেই জটিল ও গভীর কারণ সন্ধান করেননি—যেখানে যেমন পেয়েছেন তাকে সেভাবেই উপন্যাসে চরিত্রের রূপ দিয়েছেন। এভাবে চরিত্ররাজির এক চিত্রশালা রচনা করেছেন। *আনোয়ারা* উপন্যাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য, পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম বোধগুলোকে তুলে ধরা। মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের ঘরের কোণে, আঙিনায় কিংবা গোয়ালঘরে যেখানে যা ঘটছে তার নিপুণ চিত্র এঁকেছেন লেখক। স্নেহময়ী দাদি, ব্যক্তিত্বহীন অসহায় পিতা, প্রীতিস্নিগ্ধ সখী সব আছে। ঘরে পোষা মোরগ, গোয়ালের গরু, আকবরি পোলাও, সৎমায়ের বিদ্বেষ— যাবতীয় চিত্র অতি

যত্নের সঙ্গে সাজানো আছে গ্রন্থটিতে। বিশ্বাস্য, মনোরম একটি পরিচিত সংসারের হাসি-কান্না, জয়-পরাজয় অথবা দুর্যোগ ও সংকট *আনোয়ারা* উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে। আর আছে মনোরম ও আদর্শ জীবনবোধের কথা। মানুষ সংসাররাজ্যে বিবিধ ঘটনা ও সংঘাতের সম্মুখীন হয়। তবে ঘটনা ও সংঘাতের মধ্যে বাস করেও মানুষকে সৎ, পবিত্র ধৈর্যশীল হতে হবে। বিপদের মধ্যেও আত্মবিশ্বাস যেন অটুট থাকে, আনন্দ ও সুখের সময় যেন সৃষ্টিকর্তার মহিমার প্রতি শ্রদ্ধা অবিচল থাকে—ইত্যাদি আদর্শমণ্ডিত বিশ্বাসগুলো লেখক উপন্যাসটিতে সরল বিশ্বাসে এঁকে রেখেছেন। এ উপন্যাসে বাঙালি রমণীর পরিচয়কে বিশেষভাবে আলোকিত করা হয়েছে। নারীর কাছে পিতামাতা যেমন শ্রদ্ধার পাত্র তেমনি স্বামীর জন্য তার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাও অনিবার্য। পতির জীবন রক্ষা এবং পতির দুর্যোগের সময় সর্বস্ব ত্যাগের সংকল্প রমণীকে মোহনীয় করে। সৃষ্টিকর্তার কল্যাণ এসে সে রমণীকে বিপদমুক্ত করে। রমণীর এই সনাতন স্বরূপকে লেখক সরল বিশ্বাসে এঁকেছেন।

আনোয়ারা উপন্যাসে ধর্মের পবিত্র ও মাধুর্যময় দিকের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিদান করা হয়েছে। সংসারযাত্রায় বিভিন্নভাবে বিপদ, পরীক্ষা বা দুর্যোগ আসে। সে দুর্যোগ অতিক্রম করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় ঈশ্বরের প্রতি অকপট নিবেদন এবং ঈশ্বরের নিকট বিপদমুক্তির জন্য করুণা প্রার্থনা করা। যা সত্য এবং কল্যাণকর তার জয় একদিন নিশ্চিতভাবে হবেই হবে। কিন্তু সত্যের উৎকর্ষ লাভের জন্য মানুষকে কঠোর সাধনা করতে হয়। এ সাধনা ও ত্যাগের মধ্যেই পুণ্যের জয় এবং পাপের বিনাশ ঘোষিত হয়। *আনোয়ারা* উপন্যাসে এসব কথা বারবার বলা হয়েছে। মোহাম্মদ নজিবর রহমান একজন সহজ এবং মনোরম চিন্তার অধিকারী লেখক। একটি সুন্দর ও আদর্শশোভিত পারিবারিক ছবি *আনোয়ারা*।

ধর্মের মহিমা ও শক্তি সম্পর্কে নিঃসংশয় তিনি। ধর্মীয় আদর্শবাদ সম্পর্কে লেখকের কোনো বিকল্প ধারণা নেই। কিন্তু মানুষের কর্ম ও নিষ্ঠা সম্পর্কে তাঁর আস্থা আরো দৃঢ়। ধর্মান্ধ গোঁড়া মানুষ নন নজিবর রহমান। উদার মানবিক মূল্যবোধের তাড়নায় তিনি উদ্বুদ্ধ। মানুষের সৎকর্ম, সৎচিন্তা এবং সৎ সাহচর্যের গুণে অবশ্যই একটি সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে উঠবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে ও জীবনে যে সুখ ও দুঃখ ছিল, যে পরিমণ্ডলে বাংলার মধ্যবিত্ত মুসলমান জীবনাচরণ করেছে, তারই বিশ্বস্ত চিত্রায়ণ ঘটেছে *আনোয়ারা* উপন্যাসে। কিন্তু মোহাম্মদ নজিবর রহমান কেবল সরলতা ও সততাকেই প্রধান করেননি, তাঁর উপন্যাসখানিতে প্রেম-ভালোবাসা, সৌন্দর্যবোধ ও হৃদয়বোধেরও অনির্বচনীয় চিত্র আছে।

আনোয়ারা জনপ্রিয় রচনা মাত্র নয়। এটি একটি সহজপাঠ্য ও সুন্দর সাহিত্যকর্ম। বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাসে *আনোয়ারা*-র স্থায়ী অবস্থান অস্বীকার করার উপায় নেই।

কৃতজ্ঞতা

সাহিত্য-সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত উপনিষদ গ্রন্থাবলী, *রাঘববিজয় কাব্য*, *ত্রিদিববিজয় কাব্য*, *প্রশ্ন*, *বঙ্গদর্পণ*, *শান্তিশতক*, *পরবশতক* ও *মানবসমাজ* প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত, কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু শশধর রায় এম. এ. বি. এল মহাশয়; শ্রীহট্ট গভর্নমেন্ট সিনিয়ার মাদ্রাসার শিক্ষক জনাব মৌলভী মোহাম্মদ মোজাহেদ আলী বি. এ (আলীগড়) সাহেব; বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের উজ্জ্বল রত্ন, ভাষাবিজ্ঞানে সর্বপ্রথম এম. এ. ও বি. এল. পরীক্ষোত্তীর্ণ এবং আরবি, পারসি, সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত জনাব মৌলভী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব, বাংলাগদ্যে মুসলমান সুলেখক জনাব মৌলভী মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী সাহেব ও *জাতীয় মঙ্গলের* কবি জনাব মৌলভী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেব তাঁহাদের স্ব স্ব অমূল্য সময় ব্যয় করিয়া যেরূপ পরিশ্রম স্বীকারপূর্বক এই পুস্তক পরিবর্তিত ও সংশোধিত করিয়া দিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমি তাঁহাদের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিলাম। রাজশাহী কলেজ ও রাজশাহী জুনিয়ার মাদ্রাসার মুসলমান ছাত্রবৃন্দ *আনোয়ারা*-র মুদ্রণ বিষয়ে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়া আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহাদের নিকটও আমি চিরকৃতজ্ঞ।

নিবেদক

১৮ মে ১৯১৪। **মোহাম্মদ নজিবর রহমান**

পরিচয় পর্ব

প্রথম খণ্ড

১ □ আত্মহারা হইল

ভাদ্রমাসের ভোরবেলা। উত্তরবঙ্গের নিম্নসমতল গ্রামগুলি সোনার জলে ভাসিতেছে; কর্মজগতে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে; ছোট বড় মহাজনি নৌকাগুলি ধবল পাখা বিস্তার করিয়া গন্তব্যপথে উষাযাত্রা করিয়াছে, পাখিকুল সুমধুর স্বরলহরি তুলিয়া জগৎপতির মঙ্গলগানে তান ধরিয়াছে; ধর্মশীল মুসলমানগণ প্রাভাতিক নামাজ অন্তে মসজিদ হইতে গৃহে ফিরিতেছেন।

এই সময় মধুপুর গ্রামের একটি চতুর্দশবর্ষীয়া বালিকা তাহাদের খিড়কিদ্বারে বসিয়া বন্যার জলে ওজু করিতেছিল। তাহার গায়ে লালফুলের কালো ডোরা ছিটের কোর্তা। দুই হাতে ছয়গাছি চাঁদির চুড়ি। তাহার সুদীর্ঘ কেশরাশি আলগাভাবে খোঁপা বাঁধা; বালিকার মুখমণ্ডল বিষাদে ভরা!

পূর্বপারে একখানি পানসি-নৌকা পাট ক্রয়ের নিমিত্ত উত্তর-দক্ষিণমুখে লাগানো রহিয়াছে। একজন যুবক সেই নৌকার ছৈ-মধ্যে বসিয়া স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে কোরান শরিফ পাঠ করিতেছেন।

যুবকের দেহের বর্ণ ও গঠন সুন্দর; যুবকের বয়স ত্রয়োবিংশ বৎসর। মাথায় বুমিটুপি, গায়ে শাদা শার্ট ও পরিধানে রেঙ্গুনের লুঙ্গি।

নৌকার ওপর কোরান শরিফ পাঠ শুনিয়া বালিকা মস্তকোত্তোলন করিল। সে মায়ের মুখে শুনিয়াছিল কোরানের মতো উত্তম জিনিস আর কিছুই নাই, উহা যে পড়ে বা শোনে তাহার জন্য বেহেশ্‌তের দ্বার উন্মুক্ত। বালিকার দাদিমাও সদাসর্বদা বলেন, কোরান শরিফ পাঠে ও শ্রবণে মানুষের অন্তর্নিহিত অশান্তি-আগুন নিভিয়া যায়। বালিকা জননী ও দাদিমার উপদেশ হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছে। সে প্রতিদিন প্রাতে কোরান শরিফ পাঠ করে; আজও তজ্জন্য ওজু করিতে বসিয়াছে। কিন্তু নৌকার মধুবর্ষী স্বরে কোরানপাঠ বালিকাকে আত্মহারা করিয়া তুলিল। সে ওজু ভুলিয়া গিয়া অনন্যচিত্তে কোরান শরিফ পাঠ শুনিতে লাগিল।

যুবক কোরান পাঠ শেষ করিয়া দুই হাত তুলিয়া নিমীলিত নেত্রে মোনাজাত করিতে লাগিলেন :

দয়াময়! তোমার পবিত্র নামে আরম্ভ করিতেছি। সমস্ত প্রশংসা তোমার। তুমি অনাদি, অনন্ত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। তুমি ধৈর্য ও ক্ষমার আধার, তুমি অসীম করুণার উৎস। কৈশোরে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়াছি, এই যৌবনে পিতৃশোকে সংসার অন্ধকার দেখিতেছি। প্রভো! তুমি সকলই জানো; যদি গোলামকে সংসারী কর, তবু যেন প্রেমের পথে তোমাকে লাভ করিতে পারি। আমিন।

২ □ ইনিই কি তিনি!

এই সময় বালিকার পশ্চাদ্দিক হইতে, 'সই তুমি এখানে' বলিয়া আর একটি বালিকা প্রথমা বালিকার দক্ষিণপার্শ্বে আসিয়া বসিল। আগন্তুক বালিকার বয়স প্রথমা বালিকা অপেক্ষা দুই বৎসরের বেশি হইবে।

সখিত্ব-সম্বন্ধে উভয়ের মনের বিনিময় পূর্বেই হইয়া গিয়াছে। 'সই', শব্দ শুনিয়া যুবক নৌকার ভিতর থাকিয়া একটি ক্ষুদ্র জানালার ছিদ্রপথ দিয়া একটু তাকাইলেন। সেই শব্দে প্রথমা বালিকার সুখের ধ্যান ভাঙিয়া গেল। সে দ্বিতীয়া বালিকার দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল। দ্বিতীয়া বালিকা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময় মুখে কহিল, 'সই, তোমার মুখের চেহারা এরূপ হইয়াছে কেন? এমন তো কখনও দেখি নাই? রাত্রে কি ঘুমাও নাই? প্রথমা বালিকা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'গত রাত্রে মা আবার অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াছে, তাই জীবনের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়াছে; সই, আর বরদাস্ত হয় না।' বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

দ্বি-বা : কেন গালি দিয়াছিল?

প্র-বা : মগরেব বাদ হজরতের জীবনচরিত পড়িতেছিলাম, তাই রান্নাঘরে যাইয়া ভাত খাইতে বিলম্ব হইয়াছিল।

দ্বিতীয়া বালিকা বুদ্ধিমতী ও চতুরা। শিক্ষিত স্বামীর গুণে সংসারের অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছে। সে নৌকার দিকে চাহিয়া কহিল, 'ওপারে একখানি সুন্দর ছৈঘেরা পান্‌সি-নৌকা দেখিতেছি, কোথা হইতে আসিয়াছে?' প্রথমা বালিকা সরল মনে কহিল, 'জানি না, কিন্তু ঐ নৌকার দিকে চাহিয়া এতক্ষণ তাই শুনিতেছিলাম।' দ্বিতীয়া বালিকা পুনরায় নৌকার দিকে চাহিয়া কহিল, 'কৈ সই, নৌকায় তো কাহারও সাড়াশব্দ নাই।' প্রথমা বালিকাও নৌকার দিকে চাহিল। নৌকা নীরব। যুবক এই সময় পাটের জমাখরচ মিলাইতেছিলেন। তিনি বালিকাদ্বয়ের কথোপকথন শুনিতে পাইলেন।

দ্বিতীয়া বালিকা কহিল, 'যাক, কাল বিকালে তোমরা যখন স্কুল হইতে চলিয়া আস, তাহার পরই ডাকপিয়ন বাপজানকে একখানি মনিঅর্ডার দিয়া যায়। বাপজান বাড়ির মধ্যে আসিয়া মাকে বলিলেন, এই ধর ১৮টি টাকা, আলাহিদা করিয়া রাখিয়া দাও। ইহা আনোয়ারার বৃত্তির টাকা। এই টাকা আর তাহার পিতার হাতে দিব না। সে কাপড়চোপড়ে, পুঁথি-পুস্তকে মেয়েটিকে যে কষ্ট দেয়, আমি মনে করিয়াছি এই টাকা দিয়া তাহার সে কষ্ট দূর করিব।'

প্র-বা : সই, ওসব কথা থাক্, চলো, বাড়ির ভিতরে যাই, বড় মাথা ধরিয়াছে।

দ্বি-বা : মা বলিলেন, অতবড় সেয়ানা মেয়ে, তথাপি সে তার সৎমার অত্যাচার নীরবে সহিয়া তাহারই আদেশ উপদেশমতো চলে, টু শব্দটি পর্যন্ত করে না, ভুলিয়াও সৎমার নিন্দা করে না; বরং কেহ নিন্দাবাদ করিলে সেখান হইতে উঠিয়া যায়। ধন্যি মেয়ে।

প্র-বা : সই, আসল কথা কী তাই বলো।

'বাপজান কহিলেন, আনোয়ারা দেখিতে যেমন সুন্দর, তাহার স্বভাবটিও তেমনি মনোহর, আবার পড়াশুনায় আরো উত্তম। স্মরণশক্তি অসাধারণ; বিজ্ঞান ভূগোলপাঠ, ইতিহাস আদ্যন্ত মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার জামাসেলাই, নীলাম্বরী কাপড়ে ফুলতোলা দেখিয়া সেদিন ইনস্পেক্টার সাহেব তাহাকে যে ১০ টাকা পুরস্কার দিয়া গিয়াছেন, তাহা তো বোধহয় জানো? মেয়ের জ্ঞানপিপাসা দেখিয়া আমি বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছি।

মা কহিলেন, তাহা যেন হইল, মেয়ে যে বড় হইয়া গেল তাহার কী হইবে? তাহার বাপ তো এ বিষয়ে লক্ষই করিতেছে না।

বাপজান কহিলেন, তিন হাজার টাকার কাবিন, পনর শত টাকার গহনা এবং পনেরোশত টাকা নগদ লইয়া জাফর বিশ্বাসের নাতির সহিত ভূঞা সাহেব মেয়ের বিবাহ দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—শুনিলাম। মা উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, তুমি বলো কী? জাফর বিশ্বাস ডাকাত ছিল, শেষবার ধরা পড়িয়া জেল খাটিয়া মরিয়া গিয়াছে। ভূঞা সাহেব হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া রূপে মজিয়া জাফর চোরের মেয়েকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়াই কি আনোয়ারার মতো বেহেশ্‌তের হুরকে তাহাদেরই ঘরে বিবাহ দিবেন? আমার হামিদা আনোয়ারার সহিত সম্বন্ধ করিয়াছে, উভয়ের মধ্যে যেরূপ ভাব, তাহাতে এ সম্বন্ধ যাবজ্জীবন অচ্ছেদ্য। আনোয়ারার বিবাহ চোরের ঘরে হইলে, হামিদা যে সম্ভ্রমে মরিয়া যাইবে, আমরা যে কোথাও মুখ পাইব না। বিশেষত আনোয়ারা সেয়ানা মেয়ে, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সব বুঝিয়া উঠিয়াছে, সে শুনিলে যে কী ভাবিবে বলিতেই পারি না।

বাপজান কহিলেন, যার মেয়ে সে যদি বিবাহ দেয়, আমরা কী করিব? মা কহিলেন, এ বিবাহ যাহাতে না হয়, সেজন্য তোমরা দশজনে মিলিয়া শক্ত করিয়া বাধা দাও। মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, হামি, তোর সইয়ের বিবাহের কথা শুনিয়াছিস? আমি তো গোপনে তাহাদের কথাবার্তা সবই শুনিয়াছি, তবু মা'র মুখের দিকে তাকাইলাম।

আনোয়ারার ডাগরচক্ষু দুইটি নীহার-সিক্ত ফুটন্ত জবার ন্যায় লাল হইয়া উঠিয়াছে। সে হামিদার কথার আর কোনো উত্তর করিল না, কেবল মৃদুস্বরে কহিল, 'সই বড় মাথা ধরিয়াছে, চলো বাড়ির ভিতরে যাই।' এই বলিয়া আনোয়ারা উঠিয়া দাঁড়াইল, হামিদাও তাহার সঙ্গে অন্দরমুখী হইল।

এইসময় নৌকা হইতে প্রয়োজনবশত অবতরণকালে যুবক পেটকাটা ছৈ-মধ্যে দাঁড়াইয়া কাশিয়া উঠিল। হামিদা ফিরিয়া তাকাইয়া চমকিয়া উঠিল এবং ব্যাকুলভাবে ঘোমটা টানিয়া বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। আনোয়ারাও ফিরিয়া চাহিল। বালিকার আয়ত আঁখি লজ্জায় মুকুলিত হইল। পরে সে ভাবিল ইনিই বুঝি নৌকার ভিতর মধুকণ্ঠে কোরান শরিফ পাঠ ও মোনাজাত করিয়াছেন। সে ধীরপদে অন্দরে প্রবেশ করিল—কেবল অস্ফুটস্বরে কহিল : তবে ইনিই কি তিনি?

৩ ❑ সৎমায়ের কবলে

মধুপুর প্রাচীন গ্রাম। বাঁশ, আম, তেঁতুল, গাব, বট, দেবদারু প্রভৃতি সমুচ্চ বৃক্ষরাজিতে পূর্ণ। গ্রামখানি নিম্ন সমতল। আষাঢ়ে পানি আসে, আশ্বিনে শুকায়। গ্রামের চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রে প্রচুর পাট জন্মে। গ্রামের অধিবাসী সকলেই মুসলমান। মধুপুর হইতে তিন গ্রাম উত্তরে জামতাড়া; এ গ্রামের অধিবাসী বারোআনা হিন্দু। বেলতা গ্রাম মধুপুর হইতে পূর্বে একটি অনতিপ্রশস্ত স্রোতস্বিনীর তীরে অবস্থিত। এই গ্রামের তিন-চারটি ভদ্রবংশীয় উচ্চশিক্ষিত মুসলমান গভর্নমেন্টের চাকরি করেন। বেলগাঁও প্রসিদ্ধ বন্দর; মধুপুর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে স্রোতস্বতী নদীর পশ্চিম তটে অবস্থিত। পাট ও অন্যান্য বাণিজ্যদ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। বড় বড় দুই-তিনটি জুট কোম্পানি এখানে ব্যবসায়ের অনুরোধে বড় বড় গুদাম ও কলকারখানা স্থাপন করিয়াছেন।

খোরশেদ আলী ভূঞা সাহেব মধুপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও প্রধান ব্যক্তি। পৈতৃক অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল, ভূসম্পত্তি মন্দ ছিল না, এখনও মধ্যবিত্ত অবস্থা। দেড়শত বিঘা জমি, সাতখানা হাল, নয়জন চাকর, একপাল গরু। কেবল পাট বিক্রয় করিয়া বৎসরে সাত আট শত টাকা পান। বাড়ির প্রায় ঘর করোগেট টিনের। ভূঞা সাহেবের বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। বর্ণ গৌর, আকৃতি দোহারা, মুখের চেহারা নিতান্ত মন্দ নয়। কৃপণ স্বভাব ও অর্থগৃধ্নু। পিতামাতার প্রথম ও আদরের ছেলে ছিলেন বলিয়া অর্ধশিক্ষিত। তাঁহার বর্তমান অবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট নহেন, আর্থিক উন্নতি বিধানে সর্বদা চিন্তিত ও চেষ্টান্বিত। ভূঞা সাহেব নিজ গ্রাম হইতে সাত ক্রোশ দূরে রসুলপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বংশে বিবাহ করেন। বহু পুণ্যফলে তিনি ফাতেমা জোহরার ন্যায় ধৈর্যশীলা রূপবতী পত্নী লাভ করেন। ইহার গর্ভে ভূঞা সাহেবের দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পুত্রদ্বয় অকালে কাল-কবলে পতিত হয়; কন্যা জীবিত আছে। কন্যার বারো বৎসর বয়সের সময় তাহার মাতা পরলোকগমন করেন; কিন্তু ধর্মশীলা বুদ্ধিমতী জননী এই বারো বৎসরের কন্যাকে যেভাবে গড়িয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না।

কথিত আছে, জাফর বিশ্বাস ডাকাতের সর্দার ছিল। শেষ জীবনে পুলিশের চেষ্টায় ধরা পড়িয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত আট বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় এবং সেইখানেই তাহার মৃত্যু ঘটে। তাহার স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা জীবিত থাকে। পুত্রের নাম আজিমুল্লা। সুখের বিষয় যে, পিতার শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিয়া অনেকাংশে সে আত্মসংযমপূর্বক সংসার করিতেছে। কন্যার নাম গোলাপজান। গোলাপজান ভুবনমোহিনী সুন্দরী।

নিজ গ্রামের নবীবক্সের সহিত তাহার বিবাহের বন্দোবস্ত হইল। নবীবক্সের সাংসারিক অবস্থা ভালো ছিল। সংসারে বৃদ্ধা শাশুড়ি মাত্র বর্তমান, সুতরাং আদর-সোহাগে গোলাপজান সংসারে সর্বময় কর্ত্রী হইয়া উঠিল। সে এক-একটি করিয়া গোপনে গোপনে নবীবক্সের শ্রমার্জিত ঘটি-বাটি, কাপড়চোপড়, ধান-চাল, তেল-তামাক পর্যন্ত অনেক দ্রব্যই ভ্রাতা আজিমুল্লার বাটিতে প্রেরণ করিতে লাগিল। আজিমুল্লা তাহাতে আন্তরিক খুশি ছিল। কিছুদিন পর গোলাপজান এক পুত্রসন্তান প্রসব করিল। নবীবক্স গোলাপজানকে মাথায় তুলিল এবং বাছিয়া বাছিয়া পুত্রের নাম রাখিল—বাদশা।

সুখে সন্তোষে এইরূপে চারি-পাঁচ বৎসর কাটিল; কিন্তু দিন কাহারও একভাবে যায় না, নবীবক্স কার্তিক মাসের কলেরায় হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিল। তিনদিন পর তাহার বৃদ্ধা মাতাও পুত্রের পথানুসরণ করিল। গোলাপজান এখন সংসারে একাকিনী। শিশুপুত্র লইয়া কেমন করিয়া পতির সংসারে থাকিবে? সুতরাং ভ্রাতা আজিমুল্লা তাহাকে নিজ বাড়িতে লইয়া গেল এবং দুই এক করিয়া নবীবক্সের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিজ সংসারে মিশাইয়া নিজ গৃহস্থালি বড় করিয়া তুলিল। শিশু বাদশা মাতৃসহ মাতুলালয়ে মহাদরে প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

এদিকে আনোয়ারার বারো বৎসর বয়সের সময় তাহার মাতা পরলোকগমন করেন। খোরশেদ আলী ভূঞা সাহেব বিপত্নীক হইয়া দারান্তর গ্রহণের অভিলাষী হন। জামতাড়া গ্রামের আজিমুল্লা সম্প্রতি অবস্থাপন্ন লোক। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিয়া কিছু শিক্ষিতও হইয়াছিল। অবস্থা ভালো হইলে এবং তৎসঙ্গে কিছু শিক্ষাদীক্ষা পাইলে নানা দিক দিয়া লোকের খেয়াল উচ্চ হয়। আজিমুল্লা নীচ বংশের সন্তান হইলেও কৌলিক মর্যাদা লাভের আশা এক্ষণে তাহার হৃদয়ে বলবতী হইয়াছে। সে ভূঞা সাহেবকে বিপত্নীক দেখিয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার সহিত বিধবা

ভগ্নী গোলাপজানের পুনরায় বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করিল। ভূঞা সাহেব সুন্দরী গোলাপজানকে পূর্বেই দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে সাধা বিবাহের প্রস্তাবে উল্লসিত হইলেন।

এই বিবাহে ভূঞা সাহেবের মাতা অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন। ভূঞা সাহেব মাতার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। গ্রামের পাঁচজনকে দিয়া মাতাকে বুঝাইলেন, অবশেষে বিবাহ হইয়া গেল। নির্দিষ্ট দিনে প্রাণাধিক পুত্র বাদশাকে সঙ্গে করিয়া গোলাপজান ভূঞা সাহেবের ভবনে পদার্পণ করিল। বাদশা এখানে আসিয়া রামনগর মাইনর স্কুলে পড়িতে লাগিল। বাদশাকে বাদশাজাদার মতোই সুন্দর দেখাইত। ভূঞা সাহেব আনন্দে তাহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলেন।

আনোয়ারার মা বাঁচিয়া থাকিতে ভূঞা সাহেবের মা সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। তাঁহার আদেশ উপদেশানুসারে আনোয়ারার মা সংসারের সমুদয় কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন, শাশুড়িকে মায়ের অধিক ভক্তি করিতেন, উপযুক্ত সময়ে তাঁহার স্নানাহারের তত্ত্ব লইতেন। আনোয়ারা তখন হামিদাদিগের আঙিনায় তাহার সহিত বালিকা-স্কুলে পড়িত। চাকরানী বাহিরের সমস্ত কাজকর্ম নিরুত্তরে সম্পন্ন করিত। স্বামী-সোহাগ-গর্বিণী গোলাপজান অল্পদিনেই এ বন্দোবস্ত উল্টাইয়া নিজহস্তে সংসারের ভার লইল। এরূপ করিবার তাহার দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—প্রথম উদ্দেশ্য সংসারের ভার নিজহাতে থাকিলে ইচ্ছামতো জিনিসপত্র মা-ভাইয়ের বাড়ি পাঠানো যাইবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য আরও মারাত্মক।

বাদশার মা মনে করিত তার মতো সুন্দরী বুঝি আর নাই। কিন্তু যখন সে ভূঞা সাহেবের বাটিতে পদার্পণ করিয়া বারো বৎসরের মেয়ে আনোয়ারাকে দর্শন করিল; তখন তাহার রূপের গর্ব একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। সরলা বালা আনোয়ারার সহিত গোলপজানের উপমাই হয় না। কিন্তু না হইলেও গোলাপজান নিজ রূপের সহিত সতীন-কন্যার রূপের তুলনা করিয়া হিংসায় জ্বলিয়া উঠিল। সে এক্ষণে গৃহের কর্ত্রী; সুতরাং সে নানাপ্রকারে তাহার বিদ্বেষবিষে আনোয়ারাকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। সে প্রথমে আনোয়ারার পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিল এবং নানা ছলনায় অশ্রাব্য অকথ্য কটূক্তির সহিত তাহাকে দাসীগণের কার্যে সহায়তা করিতে বাধ্য করিল। বালিকা ভয়ে ভয়ে বিমাতার আদেশ পালনে প্রবৃত্ত হইল, ইহাতে তাহার নিয়মিতরূপ স্কুলে পড়া আর চলিল না। আনোয়ারার দাদিমা বিদুষী রমণী ছিলেন। নাতনীর পড়া বন্ধ হওয়ায় তিনি যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। পরন্তু, তিনি মেয়েকে দাসীর কার্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না।

একদিন তিনি গোলাপজানকে কহিলেন, 'বৌ, তুমি সংসারের কর্ত্রী হইয়াছ, তাহাতে আমি খুশি হইয়াছি; কিন্তু তোমার এ কী ব্যবহার? মেয়ে আজন্ম নিজহাতে যাহা কখনও করে নাই, আমরা দাসীর দ্বারা যে-সকল কাজ করাইয়া থাকি তুমি কোন্ আক্কেলে সেই কাজ আমার সোহাগের নাতনী দ্বারা করাইতেছ? তোমার জুলুমে নাতনীর আমার পড়াশুনা বন্ধ হইয়াছে। যাহা হউক, ইহার পর তুমি আমার নাতনীকে যে-সে-সংসারের কাজে কখনও ফরমাইশ করিতে পারিবে না। আমি কাল হইতে তাহাকে পড়িতে পাঠাইব।' বৃদ্ধার কথায় গোলাপজানের হৃদয়ে হিংসানল বেগে জ্বলিয়া উঠিল। সে বাড়িময় তোলপাড় করিয়া উচ্চকণ্ঠে নানাবিধ অকথ্য বাক্যে পঞ্চমুখে দাদি-নাতনী উভয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল।

সেই রাত্রিতে আহারান্তে ভূঞা সাহেব তাঁহার দক্ষিণদ্বারী শয়নগৃহে খাটে বসিয়া, পৈত্রিক রৌপ্য-ফরসিতে চিন্তিতমনে তামাক সেবন করিতে করিতে স্ত্রীকে কহিলেন—দেখ, আজ

সকালে তুমি যে কেলেঙ্কারি করিয়াছ, তাহাতে আমার কোনো স্থানে মুখ দেখাইবার উপায় নাই।' গোলাপজান শুনিবামাত্র ক্রোধকটাক্ষ করিয়া কহিল, 'কী করিয়াছি?' ভূঞা সাহেব যতটুকু বিরক্ত হইয়া কথাটি পাড়িয়াছিলেন, গোলাপজানের ক্রোধ-কটাক্ষ দর্শনে ততটুকু থামিয়া গেলেন। একটু সুর নরম করিয়া কহিলেন, 'মা ও মেয়েকে বাপান্ত করিয়া গালাগালি করিয়াছ কেন?' গোলাপজান গর্বভরে নিঃসঙ্কোচে কহিল, 'বেশ করিয়াছি, আরও করিব।' ভূঞা সাহেব দুঃখিত স্বরে কহিলেন, 'কথা বলিলেই তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠ, তোমাকে আর কী বলিব?'

গো-জান : সাধে কি জ্বলিয়া উঠিতে হয়!

ভূ-সা : মা ও মেয়ে তোমার কী অনিষ্ট করিয়াছিল?

গো-জান : না, তাহারা আর অন্যায় করিবে কী? তাহারা পীর-মোরশেদের মতো শুইয়া বসিয়া খাইলে কোনো দোষ নাই, আর আমি রাতদিন আগুনের তাতে চুলার গোড়ায় বসিয়া বাঁদী দাসীর মতো খাটুনি খাটিয়া তাহাদিগকে দু-একটা কাজের কথা বলিলেই যত দোষ?

ভূ-সা : কাজের কথা ছোট গলায় আদরের সহিত বলিলে দোষ হয় না। আমাদের ঘরে বৌ- ঝি অমন করিয়া গলাবাজি ও ইতরামি করিলে সমাজের নিকট আমাদের মুখ দেখানো ভার হয়।

গো-জান : (ক্রোধ-কম্পিত আননে) আমি, আমি ইতর?

এই বলিয়া অতি রোষে ঝটকা দিয়া খাট হইতে নামিয়া পড়িয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। ভূঞা সাহেব ভাবিলেন, যদি এ-সময় ঘর হইতে চলিয়া যায়, তবে মহাবিভ্রাট ঘটাইবে। রাতারাতি জামতাড়া চলিয়া যাইবে, আমার মুখে চুনকালি দিবে। এ নিমিত্ত তিনি হুঁকার নল ফেলিয়া থাবা দিয়া তাহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া ফেলিলেন।

গোলাপজানের মন নরম হইল। সে ক্রন্দনের স্বরে বলিল, 'আমি কি গৃহস্থালির লোকসান দেখিতে পারি? তোমারই সংসারের আয় উন্নতির নিমিত্ত শরীর মাটি করিতেছি। আর তোমার কলাগাছের মতো মেয়ে কেবল ফুলের সাজি হইয়া শুইয়া বসিয়া কাল কাটাইবে, তাহাকে তোমারই সংসারের কাজে এক-আধটুকু ফরমাইশ করিলে, তোমার মা মুখে যা আসে তাই বলিয়া আমাকে গালিগালাজ করে, পারে তো ধরিয়া মারে।' ভূঞা সাহেব দেখিলেন, তাহার নয়নযুগল অশ্রুপ্লাবিত হইয়াছে; মনও খুব কোমল হইয়া আসিয়াছে। তখন তিনি তাহার নয়নবারি মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, 'আর রাগ করিও না। তোমার ইচ্ছামতো সংসার চালাও, আমি আর কিছুই বলিব না।'

ফরহাদ হোসেন তালুকদার। হামিদার পিতা ও বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ভূঞা সাহেবের বাড়ির সহিত সংলগ্ন পশ্চিমাংশে ইঁহার বাটি। নিজ বাটিতেই বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে পর্দার সুন্দর বন্দোবস্ত। বিবাহিতা-অবিবাহিতা অনেক মেয়ে এই স্কুলে অধ্যয়ন করে। মধুপুরে তালুকদার সাহেবেরা বনিয়াদি ঘর। জমি বর্গা বা আধি দিয়া যে শস্যাদি প্রাপ্ত হন তদ্দ্বারা তাঁহার সংসার খরচ চলিয়া যায়। পরিবারের মধ্যে স্ত্রী, কন্যা, এক শিশুপুত্র। তালুকদার সাহেবের স্ত্রী শিক্ষিতা কন্যা হামিদাকে তাহার নিজ হাতে শিক্ষা দিয়া পূর্বোল্লিখিত বেলতা গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবকের সহিত বিবাহ দিয়াছেন। হামিদার স্বামী বি. এ. পাস করিয়া এক্ষণে ল-ক্লাসে পড়িতেছেন। ফরহাদ হোসেন তালুকদার সাহেবের ন্যায় আত্মপ্রসাদী সুখী লোক অতি বিরল। ভূঞা সাহেবের সহিত তালুকদার সাহেবের বংশগত কোনো আত্মীয়তা নাই; কিন্তু বহুকাল একত্র বাস করিয়া উভয় পরিবারে আত্মীয়তা অপেক্ষাও অধিকতর ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গিয়াছে।

ভূঞা সাহেব অপেক্ষা তালুকদার সাহেব বয়সে বড়, জ্ঞানে প্রবীণ, স্বভাবে শ্রেষ্ঠ। ভূঞা সাহেব সংসারের গুরুতর বিষয় তালুকদার সাহেবকে জিজ্ঞাসা না-করিয়া সম্পন্ন করেন না।

৪ ❑ খুব ভালো ডাক্তার

আনোয়ারা দুর্বিষহ শিরঃপীড়ায় ও জ্বরাতিশয্যে শয্যাশায়িনী হইয়া ছটফট করিতেছিল ও প্রলাপ বকিতেছিল। মাথা গেল মাথা গেল বলিয়া বালিকা চিৎকার করিতেছে।

স্নেহশীলা দাদিমা তাহার পিঠের কাছে বসিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতেছেন।

এমন সময় ভূঞা সাহেব একবার ঘরের দ্বারে আসিয়া উঁকি মারিয়া কহিলেন, 'মা, রাত্রিতে মেয়ের কি কোনো অসুখ করিয়াছিল, হঠাৎ এরূপ হইবার কারণ কী?' জননী চোখের পানি মুছিয়া কহিলেন, 'কী জানি বাছা, রাত্রিতে মেয়ের ভাত খাইতে যাওয়ায় একটু বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া বৌ তাহাকে বাপান্ত করিয়া গালাগালি করিয়াছিল, তাই বাছা আমার ঘেন্নায় ভাত-পানি ত্যাগ করিয়া ঘরে আসিয়া শোয়। শেষ রাত্রিতে যখন আমি তাহাজ্জদের নামাজ পড়িতে উঠি, তখন মেয়ে ঘুমের ঘোরে দুই-তিন বার জোরে নিশ্বাস ফেলে। শেষে মা, মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠে। ভোরে হাতমুখ ধুইয়া ঘরে আসিয়াই তাহার এ দশা হইয়াছে।'

ভূঞা সাহেব তখন ঘরে উঠিয়া স্বচক্ষে মেয়ের পীড়ার অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন এবং ধীরে ধীরে কহিলেন, 'এখন কী করা যায়? ভালো ডাক্তার নিকটে নাই, টাকাপয়সাও হাতে নাই, পাটগুলি খরিদ্দার অভাবে বিক্রয় হইতেছে না, এখন উপায় কী?'—এই বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। ছেলের কথা শুনিয়া মা ভাঙিয়া পড়িলেন। এই সময় দক্ষিণদ্বারী ঘরের বারান্দায় বসিয়া গোলাপজান মাতাপুত্রের কথাবার্তা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল। ভূঞা সাহেব প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিবামাত্র সে কুপিতা বাঘিনীর মতো গর্জিয়া উঠিল, কহিল, 'আমার গালির চোটে তোমাদের সোনার কমল শুকাইতে বসিয়াছে, এখন আর কী, পালের বড় গরুটা বেচিয়া তাহার জন্য ডাক্তার আনা হউক। তা যাহাই করা হউক, ফয়েজ (আজিমুল্লার পুত্র) কাল টাকার জন্য আসিয়াছিল, তাহাদের খুব ঠেকা। আমি বলিয়া দিয়াছি, পাট বিক্রয় হইলেই তোমাদের টাকা দেওয়াইব। আমি ভালো মুখে বলিতেছি, আমার ভাইয়ের বিনাসুদের হাওলাতি টাকা শোধ করিয়া, যাহা মনে চায়, তাহাই যেন করা হয়।' —এই বলিয়া গোলাপজান ঘৃণার সহিত মুখনাড়া দিয়া সবেগে রান্নাঘরের আঙিনার দিকে চলিয়া গেল। ভূঞা সাহেব অপরাধী মানুষের মতো চুপটি করিয়া বাহির বাড়িতে আসিলেন। এই সময়ে আনোয়ারা পুনরায় প্রলাপ বকিয়া উঠিল, 'মাগো, আমাকে কাছে লইয়া যাও, আমি আর এখানে থাকিব না।'

বেলা এক প্রহর অতীত হইয়াছে, একখানি পানসি ভূঞা সাহেবের বাহির বাড়ির সম্মুখ দিয়া পশ্চিমমুখে চলিয়া যাইতেছিল। নৌকার মাঝি ভূঞা সাহেবকে দেখিয়া কহিল, আপনাদের পাড়ায় পাট পাওয়া যাইবে? ভূঞা সাহেব কহিলেন, হাঁ আমার বাড়ি এবং আরও অনেক বাড়িতে পাট মজুত আছে। মাঝি নৌকার গতিরোধ করিয়া তাঁহার ঘাটে নৌকা বাঁধিল। একটি ভদ্রলোক ও তাঁহার পিছনে পিছনে আর একটি লোক পাট দেখিবার নিমিত্ত ভূঞা সাহেবের বাড়ির উপর নামিলেন। ভূঞা সাহেব ভদ্রলোকটিকে দেখিয়া কেমন যেন এক ধাঁধায় পড়িয়া অনেকক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন : পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের নৌকা কোথাকার? সঙ্গী লোকটি বলিল, বেলগাঁও জুট কোম্পানির।

ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, ইনি সেই কোম্পানির বড়বাবু। ভূঞা সাহেবের ধাঁধা কাটিয়া গেল। বেলগাঁও বন্দরে সকলেই ভদ্রলোকটিকে বড়বাবু বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া থাকে। বড়বাবু কোম্পানির আদেশে পাটের মওসুমে একবার করিয়া মফস্বল ঘুরিয়া পাটের অবস্থা দেখিয়া যান এবং নমুনাস্বরূপ দুই-চারি নৌকা বোঝাই করিয়া পাট লইয়া থাকেন। এবারও তিনি সেই উদ্দেশ্যেই মফস্বলে আসিয়াছেন।

ভূঞা সাহেব বড়বাবুকে সম্মানের সহিত নিজের বৈঠকখানায় বসিতে দিলেন। তাঁহার একজন চাকর একতাড়া পাট আনিয়া বড়বাবুর সম্মুখে রাখিল। সঙ্গী লোকটি পাট খুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। এই সময় তালুকদার সাহেবও পাট বিক্রয় মানসে তথায় আসিলেন। তিনিও প্রথমে বড়বাবুকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

এদিকে বহির্বাটিতে পাটের দরদস্তুর চলিতেছে, এমন সময় ভূঞা সাহেবের অন্তঃপুরে অস্ফুট ক্রন্দনের রোল উঠিল। তালুকদার সাহেব কহিলেন, বাটির ভিতরে কাঁদে কে?

ভূ-সা : বোধহয় মা।

তালু : কেন কী হইয়াছে?

ভূ-সা : মেয়েটি ভয়ানক কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

তালুকদার সাহেব 'বলো কী' বলিয়া বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া ভূঞা সাহেবকে কহিলেন, তোমার মতো নির্দয় লোক তো আর দেখা যায় না। তুমি আসন্নমৃত কন্যাকে ঘরে রাখিয়া পাট বিক্রয় করিতে বসিয়াছ! সত্বর ডাক্তার ডাকো।

এই সময় বড়বাবুর সঙ্গীলোকটি আড়ালে যাইয়া তামাক খাইতেছিল। সে বাবুর সাক্ষাতে তামাক খায় না। এ ব্যক্তি পাটের যাচনদার, বড়বাবুর সঙ্গে থাকে। যাচনদার পীড়ার কথা শুনিয়া ভূঞা সাহেবকে ছোট ছোট করিয়া কহিল, আমাদের বড়বাবু খুব ভালো ডাক্তার, বাক্সভরা ঔষধপত্র ইহার নৌকায় আছে। ইহার মত জনহিতৈষী লোক আমরা আর দেখি না। পীড়িতের প্রাণ রক্ষার জন্য ইনি নিজের প্রাণ তুচ্ছজ্ঞান করেন। এমনকি চিকিৎসার জন্য কাহারও নিকট টাকাপয়সা লন না। আপনি ইহার দ্বারা আপনার কন্যার চিকিৎসা করাইতে পারেন।

কৃপণস্বভাব ভূঞা সাহেব বিনাটাকায় চিকিৎসা হইতে পারিবে মনে করিয়া আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু কন্যা বয়স্থা মনে করিয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন। অবশেষে তালুকদার সাহেবকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলায় তিনি কহিলেন, যে অবস্থা, তাহাতে পর্দার সম্মান রক্ষা অপেক্ষা এক্ষণে চেষ্টা করিয়া মেয়ের প্রাণরক্ষা করাই সুসঙ্গত মনে করি।

ভূঞা সাহেব তখন আর দ্বিধাবোধ না করিয়া বড়বাবুকে যাইয়া কহিলেন, শুনিলাম আপনি একজন ভালো চিকিৎসক। আমার একটি কন্যা প্রাণসংশয়াপন্ন কাতর, আপনি মেহেরবানিপূর্বক তাহার চিকিৎসা করিলে সুখী হইতাম।

বড়বাবু কহিলেন, আমি চিকিৎসক নহি, তবে নিজের প্রয়োজনবশত ঔষধপত্র সঙ্গে রাখি, সময় ও অবস্থাবিশেষে অন্যকেও দিয়া থাকি।

ভূঞা সাহেব কহিলেন, তা যাহাই হউক, এই আসন্ন বিপদে আমার উপকার করিতেই হইবে।

বড়বাবু তখন পীড়ার অবস্থা শুনিয়া শিষ্টাচার জানাইয়া কহিলেন, তবে একবার দেখা আবশ্যক।

রতনদিয়া গ্রাম। কয়েক ঘর হিন্দু ব্যতীত গ্রামের অধিবাসী সবই মুসলমান। মুসলমানদিগের মধ্যে আমির উল এসলাম নামের একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাস। তিনি গ্রাম হইতে এক মাইল দূরে নীলকুঠিতে দেওয়ানি করিতেন। তিনি প্রথমে ময়মনসিংহ জেলার হাজী সুফিউদ্দিন নামক জনৈক পরম ধার্মিক মহাত্মার কন্যাকে বিবাহ করেন। আমির উল এসলাম সাহেব একটি পুত্রসন্তান লাভ করেন। পিতা নিজ নামের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন নুরল এসলাম। নীলকুঠিতে দেওয়ানি করিতেন বলিয়া আমির উল এসলাম সাহেবের বংশ দেশের সর্বত্র দেওয়ান আখ্যায় পরিচিত।

নুরল এসলামের বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁহার পিতা সমধিক মনোযোগী ছিলেন। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নুরল এসলাম স্থানীয় নবপ্রতিষ্ঠিত মাইনর স্কুল হইতে বৃত্তি লাভ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বৎসর তাহার জননী তাহাকে ও তাহার দুইটি শিশু ভগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকগমন করেন। আমির উল এসলাম সাহেব পত্নীবিয়োগে সংসার অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন বটে, তথাপি পুত্রের বিদ্যাশিক্ষায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন না। সময়মতো তিনি পুত্রকে তাহার মাতুলালয়ে রাখিয়া ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে পড়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

এদিকে সংসার অচল হইলেও দেওয়ান সাহেব দুই বৎসর যাবৎ বিবাহ করিলেন না। শেষে নানা লোকের প্ররোচনায় ও পরামর্শে গোপীনপুর গ্রামের আলতাফ হোসেন নামক এক ব্যক্তির বয়স্কা রূপবতী কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করিলেন। কালক্রমে এই পক্ষে দেওয়ান সাহেবের কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। এই কন্যা জন্মগ্রহণের পর নুরল এসলামের অপ্রাপ্তবয়স্কা ভগিনীদ্বয়ের আর এ সংসারে তিষ্ঠন দায় হইল। পত্নীর ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া দেওয়ান সাহেব কন্যাদ্বয়কে তাহাদের স্নেহময়ী মাতামহীর নিকট ময়মনসিংহে পাঠাইয়া দিলেন। নুরল এসলাম ছুটির সময় মাতুলালয় হইতে বাড়িতে আসিতেন। কিন্তু বিমাতার ব্যবহারে শান্তি লাভ করিতে না পারিয়া স্কুল খুলিবার পূর্বেই ময়মনসিংহ চলিয়া যাইতেন।

নুরল এসলাম চারি বৎসরে বৃত্তিসহ এনট্রান্স পাস করিয়া কলিকাতায় পড়িতে গেলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে মাসে মাসে বিশ-পঁচিশ টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। খোদার ফজলে নুরল এসলাম দুই বৎসরেই প্রশংসার সহিত এফএ পাস করিয়া বিএ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বৎসর শেষে অকস্মাৎ নিদারুণ সান্নিপাতিক জ্বরে তাঁহার পিতার মৃত্যু ঘটায় নুরল এসলাম সংসারে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। বিমাতার চক্রান্তে ভূসম্পত্তি ও গৃহস্থালি বিনষ্ট হইবে ভাবিয়া, সকলের ভার নিজহাতে লইলেন।

প্রতিভাবলে পঠিত বিদ্যায় নুরল এসলাম যেরূপে কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছেন, তৎসঙ্গে ভূয়োদর্শনজনিত জ্ঞানও কম লাভ করেন নাই। তিনি দেখিয়াছিলেন, চাকরিজীবীর শারীরিক ও মানসিক সমুদয় ইন্দ্রিয় সর্বক্ষণ প্রভুর মনোরঞ্জন সম্পাদনের জন্য নিয়োজিত রাখিতে হয়, স্বাধীনভাবে মানবজীবনের মহদুদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ তাহার ভাগ্যে বড় ঘটিয়া উঠে না। এ নিমিত্ত চাকরিকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। বিএ পাস করিয়া স্বাধীন ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবেন, ইহাই তাঁহার জীবনের স্থির সংকল্প ছিল।

কিন্তু পিতার মৃত্যুতে হঠাৎ তাঁহার ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিল। তথাপি তিনি সংকল্পের প্রতি লক্ষ রাখিয়া আপাতত বাড়ি হইতে ছয় মাইল পূর্বে বেলগাঁও বন্দরে জুট কোম্পানির অফিসে পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনে চাকরি গ্রহণ করিলেন। সপ্তাহে দুই-এক বার আসিয়া বাড়িঘরের তত্ত্বাবধান লইতে লাগিলেন।

কিন্তু তিনি বিএ পাস করিয়া উপার্জনক্ষম না হইলে বিবাহ করিবেন না প্রকাশ করায় তাঁহার পিতা সমস্ত সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সংসারের সমস্ত ভার তাঁহাকে নিজ স্কন্ধে লইতে হইল, তিনি উপার্জনে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বিমাতা তাঁহাকে এক দুরাশার ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিলেন। বিমাতার বিবাহযোগ্য এক পরমাসুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিল। তিনি ভাবিলেন, পতির অর্ধেক সম্পত্তি কাবিন-স্বত্বে তাঁহার প্রাপ্য হইয়াছে; এক্ষণে ভ্রাতুষ্পুত্রীকে নুরল এসলামের সহিত বিবাহ করাইয়া অপরার্ধ সম্পত্তি সেই কন্যার নামে লিখাইয়া লইবেন। ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ-সম্বন্ধ উত্থাপন করিলেন। নুরল এসলাম এ-প্রস্তাব শুনিয়া জনৈক প্রবীণ আত্মীয় দ্বারা বিনয়সহকারে মাতাকে জানাইলেন, আমি আপাতত বিবাহ করিব না, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে অন্যত্র সৎপাত্রে বিবাহ দিউন।

ভবিষতের গর্ভে কী আছে কে বলিতে পারে? ভবিষ্যৎ বড়ই দুর্গম। মানুষ মানুষের পেটের কথা টানিয়া বাহির করে, বিজ্ঞানবলে তড়িৎ ধরে, আকাশে উড়ে, সাগরে ভাসে, পাতালে প্রবেশ করে আবার মরা মানুষ জীবিত করিতে চায়। কিন্তু প্রত্যক্ষের অন্তরালে যে যবনিকা আছে তাহা ভেদ করিবার কথা ধারণায় আনিতেও অক্ষম। নুরল এসলাম তো নগণ্য যুবক।

নুরল এসলাম বুঝিয়াছিলেন মানবজীবনের সুখদুঃখ সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া মনের মতো শিক্ষিতা পাত্রী পাইলে বিবাহ করিবেন, নচেৎ করিবেন না, এইরূপ সংকল্প করিয়া তিনি এ-পর্যন্ত বিবাহ করেন নাই।

৬ □ পুনরায় ইনিই কি তিনি

ভূঞা সাহেব ও তালুকদার সাহেবের সহিত বড়বাবু আনোয়ারার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন। বালিকার দাদিমা তৎপূর্বে তাহাকে মশারি দ্বারা পর্দায় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঘরে-যে লোকজন প্রবেশ করিয়াছে, বালিকা তাহা টের পায় নাই; সে দুর্বিষহ শিরঃপীড়ায় অস্থির হইয়া এই সময় মশারি উল্টাইয়া ফেলিয়া দিল। তাহার দাদিমা 'পোড়ামুখী সব ফেলিয়া দিল' বলিয়া পুনরায় তাহাকে পর্দাবৃত করিতে চেষ্টা করিলেন। বড়বাবু কহিলেন, আচ্ছা একটু অপেক্ষা করুন আমি শীঘ্রই পীড়ার অবস্থা বুঝিতে পারিব।

এই সময় বালিকা একবার চক্ষু উন্মীলন করিল। তাহার রক্তচক্ষু দেখিয়া বড়বাবু একান্ত বিমর্ষ হইলেন এবং সত্বর মাথায় জলপট্টি দেওয়া আবশ্যক মনে করিয়া কাঁচি ও সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড চাহিলেন। ভূঞা সাহেব তাহা আনিবার জন্য কক্ষান্তরে গমন করিলেন। বড়বাবু থার্মোমিটার দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন জ্বর একশত পাঁচ ডিগ্রি। তিনি ব্যাকুলভাবে হাত ধরিয়া নাড়ি দেখিলেন। দেখিয়া বুঝিলেন সান্নিপাতিক জ্বর। বড়বাবু হতাশচিত্তে পুনরায় বালিকার মুখের দিকে চাহিলেন এবং অস্ফুটস্বরে কহিলেন, 'দয়াময় তুমি ইহাকে রক্ষা কর।' এই সময় আনোয়ারা জ্ঞানশূন্যভাবে পুনরায় চক্ষু উন্মীলন করিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিল এবং প্রলাপের বাক্যে কহিল : ইনি কি তিনি।

অতঃপর সকলে উঠিয়া বহির্বাটিতে আসিলেন। বড়বাবু নৌকা হইতে ঔষধের বাক্স আনাইয়া দুইপ্রকার দুই শিশি ঔষধ দিলেন। ক্ষুধা পাইলে দুধ বার্লি পথ্যের কথা বলিয়া দিলেন।

পাটের দরদস্তুর করিতে আর কথাখরচ কোনোপক্ষেই হইল না। ভূঞা সাহেব একশত তিরিশ মণ ও তালুকদার সাহেব সাতাশ মণ পাট পাঁচ টাকা দরে বিক্রয় করিলেন। পাটের মূল্য মিটাইয়া দিয়া নৌকায় উঠিবার সময় ভূঞা সাহেব পাঁচটি টাকা দর্শনীস্বরূপ বড়বাবুকে দিতে উদ্যত হইলেন। বড়বাবু কহিলেন, 'আমি টাকা লইয়া চিকিৎসা করি না। যেভাবে যতটুকু পারা যায়, মানুষই মানুষের উপকার করিবে, এই মনে করিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকি।' এই বলিয়া তিনি টাকা গ্রহণ করিলেন না। যাইবার সময় আরও বলিয়া গেলেন, 'আমি স্থানান্তরে পাট দেখিয়া অপরাহ্ণ তিন-চারিটার সময় পুনরায় আপনার কন্যাকে দেখিয়া যাইব। আপনারা সাবধানে পর্যায়ক্রমে ঔষধ সেবন করাইবেন।' বেলা তখন প্রায় বারোটা।

নুরল এসলাম অপরাহ্ণ চারিটায় ফিরিয়া আসিয়া ভূঞা সাহেবের সহিত তাঁহার রোগিণীকে পুনরায় দেখিলেন। জ্বর কমিয়া একশত দুই ডিগ্রিতে নামিয়াছে, চক্ষের লালিমা অনেকটা কমিয়াছে। তিনি ঔষধ বদলাইয়া দিয়া সে রাত্রি ভূঞা সাহেবের বাড়ির ঘাটেই নৌকা বাঁধিয়া অবস্থান করিলেন। মঙ্গলমতো রাত্রি প্রভাত হইলে পুনরায় তিনি রোগিণীকে দেখিতে বাড়ির মধ্যে গেলেন। দেখিলেন, নিদারুণ জ্বরোত্তাপে বালিকা সেইরূপ মলিন ও কৃশ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সুখের বিষয় তাহার জ্বর ও চক্ষুর রক্তাভ ভাব ছুটিয়া গিয়াছে। নুরল এসলাম বহির্বাটিতে আসিয়া রোগিণীর জ্বর-প্রতিষেধক বলকারক ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং কহিলেন, আমি পাটের অবস্থা দেখিতে কিছুদিন এ অঞ্চলে আছি, দুই-তিনদিন পরে আবার আসিয়া ঔষধ বদলাইয়া দিয়া যাইব।

ভূঞা সাহেব নুরল এসলামের ব্যবহারে ও মহত্ত্বে একান্ত মুগ্ধ হইলেন।

৭ ❑ টগর ও জবা জবেহ হইল

কয়েক দিন পর অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় নুরল এসলাম আনোয়ারাকে পুনরায় দেখিতে আসিলেন। এই সময়ে পুরুষমানুষ কেহই তাহাদের বাড়িতে ছিল না। বাদশা রামনগর স্কুল হইতে এখনও ফিরে নাই, চাকরানীরা ঢেঁকিশালে। গতকল্য আজিমুল্লা আসিয়া তাহার ভগিনী গোলাপজানকে লইয়া গিয়াছে। এখন কেবল আনোয়ারা ও তাহার দাদিমা উপস্থিত। ভূঞা সাহেব কোথায় গিয়াছেন, কেহই জানে না।

নুরল এসলাম বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া কহিলেন, ভূঞা সাহেব বাড়ি আছেন?

আনোয়ারার দাদিমা বৈঠকখানা ঘরের আড়ালে থাকিয়া কহিলেন, আপনি বসুন, খোরশেদ সকালবেলা যাইবার কালে বলিয়া গিয়াছে, আজ ডাক্তার সাহেব আসিতে পারেন। তিনি আসিলে নৌকায় লোকজনসহ তাঁহাকে জিয়াফত করিবেন, আমি সত্বর বাড়ি ফিরিব। এই বলিয়া বৃদ্ধা আবার কহিলেন, আমার অনুরোধ, আপনি মেহেরবানি করিয়া নৌকার লোকজনসহ গরিবখানায় বৈকালে জিয়াফত কবুল করুন।

ডাক্তার সাহেব কহিলেন, জিয়াফতের আবশ্যক কী? আগে আপনার নাতিনীর কুশল সংবাদ বলুন।

বৃদ্ধা কহিলেন, আপনার চিকিৎসার গুণে আল্লার ফজলে নাতিনী আমার সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা আনোয়ারার ঘরের সম্মুখে যাইয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আনোয়ারা দাদিমার নিকট আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, ডাকিলেন কেন?

বৃদ্ধা : ডাক্তার সাহেব আসিয়াছেন, তাঁহাকে বৈকালের জিয়াফত করিলাম, এখন পাকের যোগাড়ে যাও, আজ তোমাকেই রান্না করিতে হইবে।

শিশির মুক্তাখচিত নববিকশিত প্রভাতকমল যেমন সুন্দর দেখায়, আনোয়ারার মুখপদ্ম এই সময় তদ্রূপ দেখাইতেছিল।

প্রবীণা দাদিমা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কী যেন চিন্তা করিলেন। বিশিষ্ট ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইলে আনোয়ারাকেই পাক করিতে হইত। সে এক্ষণে পাকের কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কী রান্না করিব?

বৃদ্ধা : ঘরে পোলাওয়ের চাল আছে, ঘি মশলা সবই আছে।

আনো : তরকারি কী দিয়া হইবে?

বৃদ্ধা নাতিনীর মন বুঝিবার জন্য কহিলেন : 'তোর টগর, জবা দুইটা দে; তোর বাপ বাড়ি আসিলে কিছু দাম লইয়া দিব।' টগর ও জবা আনোয়ারার স্নেহপালিত দুইটি খাসি মোরগের নাম। আনোয়ারা স্মিতমুখে কহিল, 'দাম যদি দাও, তবে পঁচিশ টাকার কম লইব না।' বৃদ্ধা সুযোগ পাইয়া কহিলেন, 'যিনি বিনামূল্যে প্রাণরক্ষা করিলেন, তাঁহারই জন্য মোরগ চাহিলাম, সেই মোরগের দাম অত টাকা চাহিলি? এই বুঝি লেখাপড়া শিক্ষার ফল? উপকারীর উপকার স্বীকার করা বুঝি এইরূপেই শিখিয়াছিস?'

সন্ধ্যার পূর্বে ভূঞা সাহেব বাড়ি আসিলেন। আনোয়ারার মোরগদ্বয় জবেহ করিয়া পোলাওয়ের আয়োজন হইল; তালুকদার সাহেবকেও দাওয়াত করা হইল। রাত্রিতে নৌকার লোকজনসহ নুরল এসলাম ভূঞা সাহেবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন। তৃপ্তির সহিত সকলের ভোজনক্রিয়া শেষ হইল। আহারান্তে গল্পগুজব চলিল। তালুকদার সাহেব ও নুরল এসলামের পরস্পর বাক্যালাপে আনোয়ারার দাদিমা বাড়ির মধ্য হইতে নুরল এসলামের যাবতীয় পরিচয় ও অবস্থা জানিতে পারিলেন এবং জানিয়া তিনি যেন এক ভবিষ্যৎ আশার আলোক সম্মুখে দেখিতে পাইলেন।

আহারান্তে নুরল এসলাম নৌকায় আসিলেন। পাচক নৌকায় যাইয়া কহিল, 'পাকের বড়াই আর করিব না, এমন পোলাও কোর্মা জন্মেও খাই নাই। আকবরি পোলাওয়ের নাম গল্পে শুনিয়াছিলাম; আজ তাহা পেটে গেল।'

যাচনদার কহিল, 'খুব বড় আমির' ওমরাহ লোকের বাড়িতেও এমন পাক সম্ভবে না।'

নুরল এসলাম কহিলেন, 'তোমাদের কথা অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় না, পাক বাস্তবিকই অনুপম হইয়াছিল।'

৮ ❑ আমি কী বলিব!

এদিকে আনোয়ারা অনেক সময় নির্জনে অশ্রুমোচন করিয়া অনিদ্রায় কাল কাটাইতে লাগিল। হামিদা, সইয়ের মনের ভাব বুঝিয়া আশ্চর্য হইল ও নির্জনে তাহাকে নানাবিধ প্রবোধ দিতে লাগিল। আনোয়ারার দাদিমাও পৌত্রীর ভাবান্তর উপলব্ধি করিলেন।

আনোয়ারার পিতামহ আরবি-ফারসি বিদ্যায় প্রসিদ্ধ মুন্সী ছিলেন। দাদিমা আনোয়ারার বয়সেই মুন্সী সাহেবকে পতিত্বে বরণ করেন। তাঁহাদের এই বৈবাহিক জীবন যেরূপ সুখের হইয়াছিল, সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না। স্বামীর গুণে আনোয়ারার দাদিমা আরবি-ফারসি শিক্ষায় সুশিক্ষিতা হন। সুতরাং বিদ্যার অমৃত আস্বাদ তিনি পাইয়াছিলেন। সংসারের অবস্থাও তাঁহাদের খুব সচ্ছল ছিল। কিন্তু চিরসুখ সৌভাগ্য কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। বৃদ্ধার অর্ধেক বয়সে তাঁহার স্বামী এবং দুই পুত্র ও দুই কন্যা কালের কবলে পতিত হন। কিছুদিন পর তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রবধূ (আনোয়ারার মাতা) লোকান্তর গমন করেন। কেবলমাত্র পুত্র খোরশেদ আলী ও পৌত্রী আনোয়ারা বৃদ্ধার শেষজীবনের অবলম্বন হয়। স্বামী, পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূর অসহ্য শোক শান্তির জন্য বৃদ্ধা আনোয়ারাকেই অন্ধের যষ্ঠির ন্যায় বোধ করেন এবং স্বকীয় উন্নত হৃদয়ের স্নেহরাশি পৌত্রীতে ঢালিয়া দিয়া সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গিনী হন। ফলত তাহাকে বৃদ্ধার অদেয় কিছুই ছিল না।

একদিন রাত্রিতে শয়ন করিয়া বৃদ্ধা ডাক্তার সাহেবের প্রতি নাতিনীর অনুরাগ প্রকৃত কি না পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ধীরে ধীরে কহিলেন, 'আনার, শুনিলাম তোর বাপ ফয়েজউল্লার সহিত তোর বিবাহ বন্দোবস্ত করিয়াছে।'

আনোয়ারার কণ্ঠনালি শুষ্ক হইয়া আসিতেছে, সে অনেক কষ্টে ঢোক গিলিয়া মৃদুস্বরে কহিল, 'তুমি বাধা দিবে না?'

বৃদ্ধা : তোর বাপ তো আমার কথা শুনে না। বাদশার মা যা বলে তাই সে করে।

আনোয়ারা কহিল, 'আর একজন ঠেকাইবে।'

বৃদ্ধা : কে সে?

আনোয়ারা : আমরা ওজু করিয়া এক্ষণে যাঁহার নাম করিলাম।

দাদি নাতিনী এশার নামাজ পড়িয়া শয়ন করিয়াছিলেন। পুণ্যশীলা বৃদ্ধা আনোয়ারাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন : আনার, আজ তোর কথায় আমার দেল ঠাণ্ডা হইল। যাঁহার নাম করিয়াছিস বললি, তাঁহার প্রতি চিরদিন যেন তোর এইরূপ ভক্তি থাকে, সময়ে অসময়ে সকল অবস্থায় তিনিই তোকে রক্ষা করিবেন; তিনিই তোর সহায় হইবেন, তিনিই তোর মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন।

এইরূপ বলিয়া বৃদ্ধা পুনরায় প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, ডাক্তার সাহেবের সহিত তোর বিবাহের প্রস্তাব করিলে কেমন হয়?'

আনোয়ারা জড়িতকণ্ঠে কহিল, 'আমি কী বলিব!'

বৃদ্ধা : ডাক্তারের সহিত বিবাহ দিলে তুই সুখী হইবি।

বৃদ্ধা, নুরল এসলামকে উপযুক্ত পাত্রজ্ঞানে এবং নাতিনী তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে ভাবিলেন।

তিনি এই বিবাহ সংঘটন মানসে অতঃপর বিধিমতো চেষ্টায় উদ্যোগী হইলেন।

৯ ❑ গোলাপজান নিরাশ হইল

আজ ২৫শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার আনোয়ারাকে দেখিবার ও তাহার বিবাহের লগ্ন-পত্রাদি স্থির করিবার জন্য আবুল কাসেম তালুকদার, জব্বার আলি খাঁ প্রমুখ বিশ-পঁচিশ জন ভদ্রলোক

লইয়া আজিমুল্লা, ভূঞা সাহেবের বাড়িতে আসিয়াছে। ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহোপলক্ষে লোকজন আসিয়াছে, তাই গোলাপজান আজ পরমানন্দে তাহাদের নাস্তার আয়োজনে ব্যস্ত। এই সময় তাহার আদেশে একজন দাসী কূপের পাড়ে পানি আনিতে গিয়াছিল, কিন্তু পূর্ণ কলসি উত্তোলন কালে হঠাৎ দড়ি ছিঁড়িয়া তাহা কূপ মধ্যে ডুবিয়া গেল; দাসী অপ্রতিভ হইয়া কূপের পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। এ ঘটনা অল্প সময়েই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

এই বিবাহে আনোয়ারার দাদিমার সম্পূর্ণ অমত পূর্ব হইতেই ছিল। অর্থলোলুপ ভূঞা সাহেব জননীর পায়ে ধরিয়া অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া তাঁহার মত গ্রহণের চেষ্টা করেন। শেষে অসমর্থ হইয়া বলেন, 'মা তুমি এ বিবাহে মত না-দিলে আমাকে আর মধুপুরে দেখিতে পাইবে না।' একমাত্র পুত্র, তাই মায়ের প্রাণ পুত্রের কথায় শিহরিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, পুত্র হয় আত্মহত্যা করিবে, না-হয় দেশান্তরে চলিয়া যাইবে। পুত্রস্নেহাকর্ষণে তখন বৃদ্ধার পৌত্রী-বাৎসল্য শিথিল হইয়া পড়িল। তিনি এই বিবাহ সম্বন্ধে অন্য কোনো বাধাবিঘ্ন না-দিয়া ম্রিয়মাণা হইয়া রহিলেন। এক্ষণে উপস্থিত দুর্ঘটনায় পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, 'খোরশেদ! শুভক্ষণে কুয়ায় কলসি ডুবিল, সুতরাং এ বিবাহে আর কিছুতেই তোমার মঙ্গল নাই। এখনও বলিতেছি, এই বিবাহদানে নিরস্ত হও।' মায়ের কথায় পুত্রের মনে অমঙ্গলের ছায়া পড়িল বটে; কিন্তু তিনি স্ত্রী ও সম্বন্ধীর মনস্তুষ্টির জন্য এবং অর্থলোভে কহিলেন, 'মা তোমাদের ওসব মেয়েলি কথার কোনো অর্থ নাই। দড়ি ছিঁড়িয়া কূপে কি আর কখনও কলসি ডুবে না?' মা একান্ত ক্ষুব্ধা হইয়া আর কোনো দ্বিরুক্তি করিলেন না।

এদিকে ষোড়শোপচারে পাত্রপক্ষকে নাশতা খাওয়ানো হইল। আহারান্তে তাঁহারা পান-তামাক ধ্বংস ও নানাবিধ গল্পগুজবে প্রবৃত্ত হইলেন। বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্তাও দুই-চারি জন ফুসফাস ইশারা-ইঙ্গিতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষে করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাল কাহারও মুখাপেক্ষী নহে, তাহার অপরিবর্তিত নিয়মে সূর্য মধ্যগগন ত্যাগ করিয়া ক্রমে পশ্চিমদিকে হেলিয়া পড়িল।

এই সময় ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম আকাশপ্রান্তে গাঢ় মেঘের সঞ্চার হইল, তৎসঙ্গে গগনের বিশাল বক্ষ হইতে গুড়ুম গুড়ুম ধ্বনি হইতে লাগিল, বাতাস অল্প অল্প বহিয়া ক্রমশ প্রবল বেগ ধারণ করিল, শেষে ঝঞ্ঝাবাতের সৃষ্টি করিয়া দিল। বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। কিন্তু গর্জন যেরূপ হইল বর্ষণ সেরূপ হইল না। ঝঞ্ঝাবাত সুযোগ পাইয়া লঘু সূক্ষ্ম বারিধারা আছড়াইয়া আছড়াইয়া দিগন্তে ছড়াইতে লাগিল। সঘন বিকশিত বিদ্যুৎবিভায় লোক-লোচনের অশান্তি ঘটাইয়া তুলিল। দুর্বিষহ যন্ত্রণায় নারকীয় চিৎকারের ন্যায় আকাশ ভেদ করিয়া থাকিয়া চড়চড় কড়কড় শব্দ হইতে লাগিল। লোকে মনে করিল এইবার বুঝি মাথায় বাজ পড়ে।

দুর্যোগ থামিল না। বৃষ্টি, বায়ু ও বিদ্যুৎ মিলিয়া মিশিয়া প্রকৃতিকে ক্রমশ অস্থির করিয়া তুলিল। গাছপালা, তরণী—আরোহী প্রভৃতি উলটপালট খাইতে লাগিল।

সহসা একটা বজ্র ভূঞা সাহেবের বাড়ির ওপর পড়িল। ভীষণ অশনিপাতে বাটিস্থ সকলের কানে তালা লাগিল। আনোয়ারা তাহার দাদিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভূঞা সাহেবের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল; তিনি সভয়ে তথাপি সকলকে কহিলেন, ভয় নাই। পরক্ষণে দেখা গেল, তাঁহার গোশালার চালে আগুন ধরিয়াছে। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা আগুন নিভাইতে যাইয়া দেখিলেন, ভূঞা সাহেবের পালের প্রধান গরুটি মরিয়া গিয়াছে, পাশের আরও দুই-একটি গরু ও একটি রাখাল বালক আধপোড়া হইয়া মৃতবৎ অজ্ঞান রহিয়াছে। এই রাখাল বালক বৃষ্টির

প্রারম্ভে গোশালায় গরু দিয়া বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় সেখানেই বসিয়াছিল। পলকে প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়া গেল, ভদ্রলোকেরা তাড়াতাড়ি ঘরের আগুন নিভাইয়া ফেলিলেন। ফলে রাখালটিকে সেবা-শুশ্রূষা করিয়া বহুকষ্টে কথঞ্চিৎ সুস্থ করিলেন। সৌভাগ্যবশত বৃষ্টি হওয়ায় ভূঞা সাহেবের অন্যান্য ঘরগুলি আগুনের হাত হইতে বাঁচিয়া গেল।

শুভ বিবাহের প্রস্তাব-দিনে উপর্যুপরি দুইটি অশুভজনক ঘটনা ঘটিল দেখিয়া ভূঞা সাহেব কেমন যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। বিবাহ দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প শিথিল হইয়া আসিল; সন্দেহের গাঢ় ছায়ায় তাঁহার অর্থলুব্ধ হৃদয়ও সমাচ্ছন্ন হইল। তিনি একান্ত বিমর্ষ চিত্তে মায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। পুত্রকে দেখিয়া মা কহিলেন, 'খোরশেদ! তুমি আমার কথা শুনিতেছ না, এ বিবাহে তোমার সর্বনাশ হইবে।' ভূঞা সাহেব কহিলেন, 'মা সর্বনাশের আর বাকি কী? আমার দারগা (গরুর নাম) মরায় আমি দশদিক অন্ধকার দেখিতেছি। সেই গোধনই আমার ঘরে বরকত আনিয়াছিল।' এই বলিয়া ভূঞা সাহেব বালকের ন্যায় চোখের পানি মুছিতে লাগিলেন। মা নিজ অঞ্চলে পুত্রের চোখ মুছিয়া দিয়া কহিলেন, 'বাবা, সাবধান হও। তোমার পিতা বলিতেন, নীচ বংশের কন্যা আনিলে যত দোষ না হয়, নীচ ঘরে মেয়ে বিবাহ দেওয়ায় তাহা অপেক্ষা বেশি দোষ। তুমি তোমার পিতার উপদেশ স্মরণ করিয়া চলো; বিবাহের কথা আর মুখেও আনিও না। আমি দেখিয়া শুনিয়া সত্বরই ভালো ঘরে ভালো বরে আমার আনারকে সমর্পণ করিতেছি।' ভূঞা সাহেব মাতার কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

এদিকে প্রকৃতি শান্ত হইল। পাত্রপক্ষকে কোনোপ্রকারে আহার করানো হইল। তাঁহারা ভূঞা সাহেবের বিমর্ষভাব দেখিয়া ও আকস্মিক দুর্ঘটনার বিষয় চিন্তা করিয়া বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা তখন যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। সকলে ভগ্নমনোরথ হইয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন। প্রকারান্তরে বিবাহ ভাঙিয়া গেল। ভূঞা সাহেব হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, আনোয়ারার দাদিমা বিবাহভঙ্গে উপস্থিত বিপদেও খোদাতায়ালার নিকট শোকরগোজারি করিতে লাগিলেন। গোলাপজান বড় আশায় নিরাশ হইল।

১০ ❑ যুবক যুগল

স্টেশনে লোকে লোকারণ্য। অফিস আদালত, স্কুল কলেজ, মহাজনি আড়ত প্রভৃতি বন্ধ হইয়াছে। উকিল মোক্তার ছাত্র শিক্ষক, হাকিম প্রফেসর, কেরানি চাপরাসি প্রভৃতি নানাশ্রেণীর লোক গৃহে ফিরিবার জন্য প্লাটফরমে উপস্থিত।

আজ টিকিট করা যে কত কঠিন তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যকে বুঝানো দায়। ইন্টারক্লাস গাড়ির একটি কামরায় এক বেঞ্চে পরস্পর ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে দুইটি যুবক উপবিষ্ট। উভয়ের মাথায় তুর্কি টুপি; কিন্তু একজন কালো কোট-প্যান্টধারী, অন্যজন কালো আচকান ও শাদা পায়জামা পরিহিত।

একজন বৃদ্ধ কহিলেন, 'সব খোদাতায়ালার মরজি; এক চেহারা।'

যুবকদ্বয় পরস্পরের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। তৎপর কোটধারী যুবক আচকানধারী যুবককে কহিলেন, 'আপনি কোথায় যাইবেন?'

আ-ধা : বেলগাঁও জুট কোম্পানি অফিসে।

কোটধারী তাঁহার দিকে সবিস্ময়ে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর কহিলেন, 'আপনি তথায় চাকরি করেন?'

আ–ধা : জি, হাঁ।

কো–ধা : আপনি কি পাটের মওসুমে মফস্বলে যান?

আ–ধা : জি, হাঁ।

কো–ধা : গত ভাদ্রমাসে কি মফস্বলে গিয়াছিলেন?

আ–ধা : জি।

কো–ধা : কোন দিকে গিয়াছিলেন?

আ–ধা : মধুপুর অঞ্চলে।

কোটধারী মনে মনে ভাবিলেন ইনিই হামির লিখিত আনোয়ারার প্রাণচোরা পুরুষবর হইবেন।

কোটধারী স্মিতমুখে কহিলেন, 'বেলতা।'

যে দিবস রাত্রিতে নুরল এসলাম ভূঞা সাহেবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন, সেইদিন গল্পগুজব প্রসঙ্গে তিনি তালুকদার সাহেবের নিকট শুনিয়াছিলেন, তাহার কন্যার জামাতা কলিকাতায় ল–ক্লাসে পড়িতেছেন, বাড়ি বেলতা, নাম আমজাদ হোসেন এবং তাহার চেহারা ঠিক তাহারই চেহারার মতো। এক্ষণে ভাবিলেন, ইনিই তালুকদার সাহেবের জামাতা হইবেন এবং বোধহয় খিড়কিদ্বারে দৃষ্টা অলঙ্কারাদি পরিহিতা বালিকাই এ মহাত্মার সহধর্মিণী হইবেন; পরন্তু ইঁহার স্ত্রীই বোধহয় পত্রযোগে ইঁহাকে সব কথা লিখিয়া জানাইয়াছেন।

ফলত এইরূপ দৈব মিলনে, এইরূপ কথোপকথনে মনে মনে একে অন্যকে অনেকটা চিনিয়া লইলেন। তথাপি খাঁটি সত্য জানিবার জন্য আচকানধারী কোটধারীকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি ল–ক্লাসে পড়েন?'

কোটধারী রহস্যভাবে কহিলেন, 'আপনাকে জ্যোতির্বিদ বলিয়া বোধ হইতেছে?'

আ–ধা : আপনার নাম আমজাদ হোসেন নয়?

আ–ধা : মধুপুর আপনার শ্বশুরবাড়ি কি?

কো–ধা : তারপর?

কো–ধা : আপনার নাম নুরল এসলাম, আপনি এখনও অবিবাহিত।

উল্লিখিতরূপে রহস্যালাপে ক্রমে উভয়ের প্রকাশ্য পরিচয় হইয়া উঠিল। পরিচয়ে হৃদ্যতা জন্মিল।

এই সময় হঠাৎ নবপরিচিত যুবকযুগলের বিশ্রম্ভালাপের মধ্যে এক বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িল। গাড়িতে কোটধারী অর্থাৎ আমজাদ হোসেনের উদরাময়ের লক্ষণ দেখা দিল। বিশেষ ভাবনার কথা! তখন কলিকাতা অঞ্চলে কলেরার খুব বাড়াবাড়ি। আচকানধারী নুরল এসলাম চিন্তিত হইলেন। তিনি ভালো ভালো হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এবার বাক্স পুরিয়া লইয়া বাড়ি চলিয়াছেন। ট্রাঙ্ক হইতে ঔষধ বাহির করিয়া এক দাগ আমজাদকে সেবন করাইলেন। ভোরে উভয়ে গোয়ালন্দ স্টেশনে নামিলেন। নামিবার পর রাস্তায় আমজাদের অত্যন্ত বমি হইল, এবার তিনি খুব কাতর হইয়া পড়িলেন। নুরল তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া স্টিমারে তুলিলেন এবং নিচের তলায় সুবিধামতো স্থান লইলেন।

আমজাদকে স্টিমারে লইয়া গিয়া নুরল এসলাম বিশেষ বিবেচনাপূর্বক ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সম্মুখে নুরল এসলামের নামিবার স্টেশন। আমজাদকে প্রায় সমস্ত দিন রাস্তায়

কাটাইতে হইবে। তখন বেলা দশটা। নুরল এসলাম ভাবিলেন, ইনি যেরূপ কাতর হইয়াছেন, তাহাতে সত্বর ভালো চিকিৎসা হওয়া আবশ্যক। এমতাবস্থায় একাকী ইঁহাকে রাস্তায় ফেলিয়া যাওয়া বা ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য নহে। আমজাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও নুরল পালকি করিয়া তাঁহাকে নিজ বাড়ি লইয়া গেলেন।

বাড়িতে লইয়া যাওয়ার পর, আমজাদের ঘন ঘন ভেদবমি হইতে লাগিল, প্রস্রাব বন্ধ হইয়া পেট ফাঁপিয়া উঠিল। নুরল এসলাম মহাচিন্তিত হইলেন। আমজাদ ভাঙা গলায় কহিলেন, 'দোস্ত, আর বাঁচিবার আশা নাই। আমার বাড়িতে একটা তার করিয়া দাও। তোমার উপকারের প্রতিদান করিতে পারিলাম না। ইহাই আক্ষেপ থাকিল।' এই বলিয়া আমজাদ কাঁদিয়া ফেলিলেন। নুরল এসলাম তাঁহার চক্ষের পানি মুছিয়া দিয়া কহিলেন, 'তুমি ভীত হইও না, ইহা অপেক্ষা কঠিন কলেরায় লোকে আরোগ্য হয়। আমি বেলগাঁও হইতে এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনকে আনিতে পাঠাইয়াছি।'

এই সময় সার্জন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অবস্থা দেখিয়া ঔষধ দিলেন এবং রাত্রিতে আসায় চতুর্গুণ ভিজিট লইয়া বিদায় হইলেন। নুরল ও তাঁহার ফুপু সারারাত আমজাদকে ঔষধ সেবন করাইলেন ও সেবাশুশ্রূষা করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। কিন্তু পীড়ার উপশম না দেখিয়া নুরল প্রাতে স্বয়ং বেলগাঁও যাইয়া বেলতায় তার করিলেন। তার পাইয়া আমজাদের পিতা মীর নবাব আলী সাহেব ও আমজাদের শ্বশুর ফরহাদ হোসেন তালুকদার সাহেব ছেলেকে দেখিতে রতনদিয়ায় রওয়ানা হইলেন।

এদিকে নুরল এসলাম বেলগাঁও হইতে প্রাতে আর একজন ভালো ডাক্তার লইয়া গেলেন। আল্লার ফজলে তাঁহার চিকিৎসায় আমজাদ আরোগ্যের পথে দাঁড়াইলেন। তাঁহার পিতা ও শ্বশুর রতনদিয়ায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং বাড়িতে পুনরায় তার করিলেন। মীর নবাব আলী সাহেব পুত্রের সহিত নুরল এসলামের একাকৃতি দেখিয়া তাজ্জব বোধ করিতে লাগিলেন।

১১ ❑ শুভস্য শীঘ্রম

পাঁচ বিঘা জমি জুড়িয়া নুরল এসলামের বাড়ি। চারিদিক প্রাচীরবেষ্টিত। প্রাচীরের ভিতর দিকে যথাস্থানে রোপিত ফলবান বৃক্ষাদি, পশ্চিমাংশে পুষ্করিণী। বাড়িতে নিত্যপ্রয়োজনীয় এগারোখানি ঘর; তন্মধ্যে রান্নাঘর, ভাণ্ডারঘর ও বৈঠকখানা ঘর করগেট টিনে নির্মিত। অন্যান্য ঘরগুলি খড়ের। নুরল এসলামের পিতা টিনের ঘর ভালোবাসিতেন না। বৈঠকখানার ঘরখানি সাহেবি ফ্যাশানের প্রকাণ্ড আটচালা। আটচালার সম্মুখে ফুলের বাগান, তাহার সম্মুখে দূর্বাদল-শোভিত পতিত ক্ষেত্র। পতিত ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যেন একখানি সবুজ গালিচা বিস্তৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। বাগান হইতে পতিত ক্ষেত্রের উপর দিয়া অনতিউচ্চ সরল বাঁধারাস্তা দক্ষিণ প্রাচীরের সদর-দ্বার পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার দুইধারে সারি-সারি গুবাকবৃক্ষ সৈন্যশ্রেণীর ন্যায় সদর্পে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রাচীরের বাহিরে অনতিদূর দিয়া গভর্নমেন্টের বাঁধা-সড়ক বেলগাঁও বন্দর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে জেলা পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।

আমজাদ হোসেনকে বৈঠকখানা ঘরের অন্দরমহল সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার পিতা ও শ্বশুরকে মধ্যপ্রকোষ্ঠে স্থান দেওয়া হইল। চারি-পাঁচ দিন মধ্যে আমজাদ সুস্থ

হইয়া উঠিলে তাঁহারা বাড়ি যাইতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু নুরল এসলামের বিশেষ অনুরোধে তাঁহাদিগকে আরও দুই-তিন দিন তথায় থাকিতে হইল। তাঁহারা নুরল এসলামের আতিথ্য সৎকারে ও অমায়িক ব্যবহারে একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। আমজাদের সহিত নুরল এসলামের বন্ধুত্ব সবিশেষ ঘনীভূত হইল। দৈবঘটনায় আমজাদ হোসেনের পীড়া উপলক্ষে ফরহাদ হোসেন তালুকদার সাহেবের সহিত পুনরায় দেখা হওয়ায়, নুরল যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহাদের বাড়ি রওয়ানা হইবার পূর্বে আমজাদ নুরল এসলামকে কহিলেন, 'এখন আমার রেলওয়ের গণনা, কার্যে পরিণত করিতে ইচ্ছা করি।' নুরল এসলাম তাঁহার বিবাহের কথা বিমাতা ও ফুপুআম্মাকে জানাইলেন। ফুপুআম্মা আগ্রহ সহকারে মত দিলেন। অগত্যা বিমাতাও সম্মতি জানাইলেন। নুরল এসলাম স্মিতমুখে আসিয়া বন্ধুকে কহিলেন : শুভস্য শীঘ্রম।

পরদিন আহারান্তে পিতা ও শ্বশুরের সহিত আমজাদ বাড়ি রওয়ানা হইলেন। যথেষ্ট শিষ্টাচার সহকারে নুরল এসলাম তাঁহাদিগকে স্টিমারে তুলিয়া দিয়া আসিলেন। বৈকালে তাঁহারা বাড়ি পৌঁছিলেন। আমজাদের মা ছেলেকে পাইয়া হাতে স্বর্গ পাইলেন, অন্যান্য সকলে আনন্দিত হইলেন, হামিদা স্বামীদর্শনে মৃতদেহে প্রাণ পাইল এবং দুই রেকাত শোকরানার নামাজ আদায় করিল।

১২ ❑ বিবাহ হইয়া গেল

আমজাদের পিতার যে-কথা সেই কাজ। তিনি মধুপুরের ভূঞা সাহেবের বাড়িতে আসিয়া বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন ও বন্দোবস্ত একই সঙ্গে করিয়া ফেলিলেন।

বেলতার মীরবংশ আভিজাত্যে দেশবিখ্যাত। আমজাদের পিতা বর্তমান সেই বংশের মুরব্বি; তাঁহার মানসম্ভ্রম যথেষ্ট। তিনি তেজস্বী কর্মবীর বলিয়া খ্যাত। ভূঞা ও তালুকদার সাহেব তাঁহাকে বড় মুরব্বি বলিয়া সম্মান করেন। তাঁহার আদেশ-উপদেশমতো কার্য করা গৌরবজনক বলিয়া ভাবেন। উপস্থিত বিবাহ প্রস্তাবে ভূঞা সাহেব কোনো ওজর-আপত্তি করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহার কৃপণতা ও অর্থের লোভ দূরে পলায়ন করিল। গোলাপজানও যেন কী বুঝিয়া বিশেষ কোনো আপত্তি করিল না।

অতঃপর রতনদিয়ায় চিঠি লেখা হইল : আগামী ২৭শে আশ্বিন আমরা শুভ বিবাহের দিন স্থির করিয়াছি। তাহার পূর্বে বা পরে ভালো দিন নাই; পাত্রীকে কেবল তিন হাজার টাকার কাবিন দিতে হইবে। বস্ত্রালঙ্কার ও অন্যান্য ব্যয় আপনাদের ইচ্ছাধীন। আশা করি, এ বন্দোবস্তে আপনাদের অমত হইবে না।

মীর সাহেবের পত্র পাইয়া নুরল এসলামের বাড়িতে বিবাহের ধুম পড়িয়া গেল। তিনি জুট ম্যানেজার সাহেবের নিকট একমাসের বিদায় লইলেন। কেবল ভাদ্রমাসের খরিদ পাটে নুরল এসলাম কোম্পানিকে তিন হাজার টাকা লাভ করিয়া দিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত কোম্পানির গুণগ্রাহী ম্যানেজার সাহেব তাঁহাকে বিবাহ বাবদ তিনশত টাকা দান করিলেন। নুরল এসলামের আত্মীয়-কুটুম্বে, বন্ধু-বান্ধবে, চাকর-চাকরানীতে তাহার বাড়িঘর জনপূর্ণ হইয়া উঠিল।

নির্দিষ্ট দিনে নুরল এসলাম নওশা সাজিয়া, পাত্রমিত্রসহ আনোয়ারার পাণিগ্রহণ বাসনায় মধুপুরে উপস্থিত হইলেন। আজ ভূঞা সাহেবের বৃহৎ ভবন আনন্দকোলাহলে মুখরিত। হামিদাও সই-এর বিবাহে আসিয়াছে। সে শুভবিবাহে আনন্দে আত্মহারা। তাহার দাদিমা

আশাপূর্ণহেতু উৎফুল্লা ও ব্যয়বাহুল্য মুক্তহস্তা। অন্যান্য রমণীগণও বিবাহের আনন্দে আনন্দিতা। কেবল একটি স্ত্রীলোক আজ আন্তরিক আনন্দিতা না হইলেও কেবল লোকলজ্জা ভয়ে মৌখিক আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। বলাবাহুল্য, ইনি আনোয়ারার বিমাতা গোলাপজান।

অপরাহ্নে পাত্রপক্ষ হইতে নয়শত টাকার অলঙ্কার, তিনশত টাকার শাড়ি প্রভৃতি বস্ত্রাদি ও তিনহাজার টাকার কাবিননামা বাড়ির মধ্যে পাঠানো হইল। হামিদা ষাট টাকা মূল্যের একটি অঙ্গুরী সখিত্বের নিদর্শনস্বরূপ সই-এর অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিল এবং তাহার আগুল্‌ফ লম্বিত কেশরাশি বিনাইয়া বিনাইয়া চিত্রবিচিত্রভাবে খোঁপা করিয়া বাঁধিয়া দিল। আনোয়ারার দাদিমার আদেশে হামিদার পুণ্যশীলা জননী আনোয়ারাকে বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করাইলেন।

বালিকার হৃদয়ের অনুরাগ-জ্যোতি এখন তাহার সুন্দর মুখে প্রতিফলিত। অন্তরের জ্যোতি বাহিরের জ্যোতিতে আসিয়া মিশিয়াছে। সত্য সত্যই সে আজ বিবাহের সাজে সৌন্দর্যের মহিমান্বিতা পাটরানী সাজিয়াছে।

সমাগত স্ত্রীলোকেরা অনিমেষ দৃষ্টিতে বালিকার রূপ দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। কেহ কহিলেন, এমন রূপ জন্মেও দেখি নাই। কেহ কহিলেন, এ তো মেয়ে নয় সাক্ষাৎ পরী। এ মেয়ে পরীও নহে, পরীদিগের মাথার মণি।

সাতাশে আশ্বিন সোমবার রাত্রিতে শুভক্ষণে আনন্দকোলাহল মধ্যে মোহাম্মদ নুরল এসলাম মোসাম্মৎ আনোয়ারা খাতুনের পাণিগ্রহণ করিলেন।

নুরল এসলাম বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক বাড়ি ফিরিতে উদ্যত হইলেন। আনোয়ারা দাদিমার অঞ্চল ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল। বৃদ্ধাও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। নিরুদ্ধ নয়নবারি দরবিগলিত ধারায় তাঁহার বক্ষস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল। তিনি শোকমোহে কাতর হইয়াও পৌত্রীকে প্রবোধ ও উপদেশ দিতে লাগিলেন : চিরদিন পিতৃগৃহে বাস করা কন্যার কর্তব্য নহে, শরিয়তমতে দুনিয়ায় পতিগৃহই তাহার প্রকৃত আবাসস্থল; পরন্তু পতিসেবা না করিলে স্ত্রীলোকের নামাজ, রোজা, ধর্মকর্ম সব বিফল। অতএব তুমি পতিসেবা মাহাত্ম্যে ধর্মকর্ম রক্ষা করিবে।

এই সারগর্ভ উপদেশ দিয়া বৃদ্ধা স্বয়ং চোখের পানি মুছিতে মুছিতে রোরুদ্যমানা পৌত্রীকে তাহার স্বামীর সহিত বিদায় দিলেন।

সংসার পর্ব

দ্বিতীয় খণ্ড

১ ❑ ভার্যা সর্বগুণান্বিতা

নুরুল এসলামের বিবাহের পর দেখিতে দেখিতে চারিটি বৎসর অতীতের পথে অনন্ত কালসাগরে মিশিয়া গিয়াছে। সময়ের এই ক্ষুদ্র অংশটুকুর মধ্যে পারিবারিক জীবন তথা বিরাট বিশ্বপরিবারে ছোট-বড় কত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে।

নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে নুরুল এসলামের সহিত সাধিয়া বিবাহ দিতে যাইয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন এইজন্য নুরুল এসলামের বিমাতা আপনাকে যারপরনাই অপমানিত বোধ করিয়াছেন। পরন্তু নুরুল এসলাম তাঁহার প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া হুরপরীর মতো সুন্দরস্বভাব সুশীলা বিদুষী ভার্যা গৃহে আনিয়াছেন—তাহার উপর যে ভার্যা সর্বগুণান্বিতা এবং গৃহস্থালির সর্ববিষয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় ঘর-বাহিরের সমস্ত কার্যের শৃঙ্খলা পারিপাট্য বিধানে ও অবিশ্রাম কর্মপ্রিয়তায় সে অল্পদিনেই প্রবীণা গৃহিণীর ন্যায় গৃহলক্ষ্মী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার হাতের গুণে শাকভাতও অমৃতের মতো বোধ হইতেছে।

এক রাত্রি আহারান্তে সালেহা তাহার মায়ের কাছে শুইয়া বলিতে লাগিল : মা, আজ সকালে ভাবী যে মুড়িঘণ্ট পাক করিয়াছিলেন, তাহার স্বাদ এখনও জিহ্বায় লাগিয়া রহিয়াছে। তিনি যে কী ডাইল পাক করেন, শুধু তাই দিয়া ভাত খাইয়া উঠা যায়।

মা : (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) ও পাকে বিষ মাখানো; তাহাতে আমাদের মরণ।

মেয়ে : সে কী মা! তিন চারি বৎসর হইল খাইতেছি, মরি তো না?

মা : অভাগীর বেটি তুই, তা বুঝবি কী করিয়া?

মেয়ে : বুঝাইয়া দেও না।

মা : (বিরক্ত হইয়া) তুই গোল্লায় যা। বুঝাইলাম কী, আর বুঝলি কী?

মেয়ে : কী বুঝাইলে?

মা : দুইদিন পরে আমাদিগকে বৌ-এর বাঁদী হইয়া সংসারে থাকিতে হইবে। একটু আগেই একজোড়া কাপড় দিয়াছে, তাই তাহার পরানে সয় নাই। এমন ছোটলোকের মেয়ে কি আছে!

মেয়ে : না, ভাবী ছোটলোকের মেয়ে নয়। আমি শুনিয়াছি, ভাবীর বাপের বাড়িতে বড় বড় টিনের ঘর, পালে পালে গরু, ভেড়া, চাকরবাকর বাড়ি ভরা।

মা : হাবা মেয়ে, বড় বড় টিনের ঘর থাকিলেই বুঝি বড়লোক হয়? ওর বাপ-দাদা যে ভুঁইমালী ছিল, তার মা আবার চোরের মেয়ে।

মেয়ে : তুমি বলো কী। তবে কি ভাবীর বাপ-দাদারা আমাদের ঝাড়ুদার বলাই মালীদের জাত?

নুরুল এসলামের প্রপিতামহের আমল হইতে ভুঁইমালী তাহাদের উঠান পরিষ্কার করিত, ঘরে ডোয়া বাঁধিত, এজন্য মালীর চাকরান জমি ছিল। এক্ষণে বলাই মালী সেই কাজ করে।

মা বলিল, হাঁ ওর বাপদাদারা আগে ভুঁইমালী ছিল, শেষে জাত যাইয়া মুসলমান হয় এবং ভুঁইয়া খেতাব পায়।

মেয়ে : ভাবীর মা কি সত্যি চোরের মেয়ে?

মা : নয় তো কী?

মেয়ে। তুমি এত কিরূপে জানো?

মা : তোমার মামুর মুখে শুনিয়াছি বৌ-এর বাপদাদার খবর। আর বৌ-এর বাপের বাড়ির বাঁদীর মুখে শুনিয়াছি তার মা'র পরিচয়।

সালেহার মামু ও আনোয়ারার বাঁদী যে ঐরূপ কথা বলিয়াছিল, তাহা সত্য। তাহাদের ঐরূপ বলিবার কারণ ছিল। সালেহার মামু নুরল এসলামের সহিত কন্যা বিবাহ দিতে যাইয়া প্রত্যাখ্যাত হন এবং আনোয়ারার দাসীকে আনোয়ারার বিমাতা গোলাপজান জ্বালাতন করিত।

২ ❑ হায়রে জিদ

আজ নুরল এসলামের অফিস হইতে বাড়ি আসিবার দিন। ইংরেজ বণিকেরা রবিবারে অফিস বন্ধ না-রাখিলেও সেদিন তাঁহাদের বৈষয়িক কার্যাদি কম হয়। ম্যানেজারের প্রিয়পাত্র নুরুল এসলাম এ নিমিত্ত শনিবার বৈকালে বাড়ি আসিয়া থাকেন, সোমবার অপরাহ্নে অফিসে হাজির হন।

আনোয়ারা রোজ প্রাতে কোরান শরিফ পাঠ করে। আজ পড়িতে পড়িতে একটু বেলা হইয়াছে। সালেহা তাহার ঘরের কাছে গিয়া কহিল, আজ যে মালীর মেয়ের কোরান পড়া এখন শেষ হল না? রোজই ভাতের বেলা হয়, আমি যে খিদেয় মরি, তা কে দেখে?

এ-কথা নুরল এসলামের ফুফুআম্মার কানে গেল। তিনি নুরল এসলামের পিতার চাচাতো ভগিনী; প্রৌঢ় বয়সে বিধবা হইয়া একটি পুত্র ও একটি কন্যাসহ অনন্যোপায়ে নুরল এসলামের পিতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইঁহার ন্যায় ধার্মিকা স্ত্রীলোক কম দেখা যায়। ইনি বারো মাস রোজা রাখেন এবং সর্বদা তসবি পাঠে রত থাকেন। ইনি নুরল এসলামের পিতার কনিষ্ঠা ছিলেন; কিন্তু ইঁহার স্বভাব ও ধর্মশীলতা দেখিয়া নুরল এসলামের পিতা ইঁহাকে সহোদরা জ্যেষ্ঠা ভগিনী অপেক্ষা অধিক ভক্তি ও যত্ন করিতেন। নুরল এসলামের পিতার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই ক্রমে ফুফুআম্মার পুত্রকন্যাদ্বয় কাল-কবলে পতিত হয়। এক্ষণে নুরল এসলামই তাঁহার পুত্রকন্যা। নুরল এসলামের গৃহস্থালিই তাঁহার নিজের গৃহস্থালি।

ফুফুআম্মা সালেহার কথা শুনিয়া কহিলেন, তুই ও কী কথা বললি? তোর কি আদব আক্কেল কিছুই নাই?

সালেহা : আপনি আর বড়াই করিবেন না, আপনার ভাইপুত যে মালীর ঘরে বিয়ে করিয়াছে, তা বুঝি আমি জানি না?

ফুফু : ও মা, সে কী কথা!

সালেহা : ভাবীর বাপদাদারা ভুঁইমালী ছিল, শেষে জাত যাওয়ায় মুসলমান হইয়া ভুঁইঞা হইয়াছে। তাহার মা আবার চোরের মেয়ে। এসব কথা আর চাপা দিলে চলিবে না। আমি সব শুনিয়াছি। ছি ছি! এমন বৌ ঘরে আনিয়া আবার বড়াই?

ফুফুআম্মা তো শুনিয়া অবাক। আনোয়ারা আকাশ-পাতাল ভাবিয়া ভাঙিয়া পড়িল। কথিত আছে—পৃথিবী সর্বংসহা হইলেও সুচের ঘা সহ্য করিতে পারে না। আর স্ত্রীলোক পরম ধৈর্যশীলা হইলেও পিতামাতার অযথা নিন্দাবাদ সহিতে পারে না। সালেহার কথায় আনোয়ারার হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। সে উচ্চবাচ্য না করিয়া সারাদিন অনাহারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইল।

অপরাহ্ণ চারটায় নুরল এসলাম বাড়ি আসিলেন। তাঁহার আগমনে আজ কেহই আনন্দিত নহে। ফুফুআম্মা তাঁহাকে স্নেহসম্ভাষণ করিলেন না। বিমাতার মুখ বিষাদবিষে পূর্ণ । সরলা সালেহাও উৎফুল্ল নহে।

নুরল এসলাম স্ত্রীর মুখে কোনো কথা না জানিতে পারিলেও তাঁহার সরলা ফুফুআম্মার মুখে যাহা শুনিলেন, তাহাতেই বুঝিয়াছিলেন বিমাতা তাঁহার পারিবারিক সুখ-শান্তির ঘরে আগুন ধরাইয়া দিয়াছেন এবং সে আগুনে তাহার প্রেমময়ী প্রাণাধিকা জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছে। কিন্তু ধৈর্যবশত মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতেছে না। এ পর্যন্ত নুরল স্ত্রীর দেখাদেখি নীরবে সব সহ্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আজ স্ত্রীর বিষাদমাখা মুখ দেখিয়া তাঁহার ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করিল। তিনি ফুফুআম্মাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কী হইয়াছে।

ফুফু—বাবা, হইবে আর কী? তোমার জাতিপাতের কথা শুরু হইয়াছে।

নুরল—(ব্যাকুলভাবে) সমস্ত কথা খুলিয়া বলুন।

ফুফু : তুমি নাকি মালীর মেয়ে বিবাহ করিয়াছ?

নুরল এসলাম শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, 'এমন কথা কে বলিল?'

ফুফু : সকালবেলা সালেহা বলিয়াছে।

নুরল : সে এমন সৃষ্টিছাড়া কথা কোথায় পাইল?

ফুফু : জানি না।

নুরল এসলাম সালেহাকে ডাকিলেন। সালেহা নুরল এসলামের ক্রোধ দেখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উপস্থিত হইল। নুরল সহোদরা ভগিনী জ্ঞানে সালেহাকে এতদিন স্নেহের 'তুই' শব্দ ব্যবহার করিতেন। আজ কহিলেন, 'সালেহা! তুমি ঠিক করিয়া বলো, তোমার ভাবী যে মালীর মেয়ে, এ-কথা তোমাকে কে বলিয়াছেন?'

সালেহা নীরব। নুরল তাহাকে ধমক দিয়া কহিলেন, 'বলো না; ঠিক কথা না-বলিলে তোমার ভালো হইবে না!'

সালেহা পিছন ফিরিয়া মায়ের ঘরের দিকে চাহিল, মা ইশারায় বলিতে নিষেধ করিলেন। নুরল আবার কহিলেন, 'বলো না!' সালেহা কহিল, 'বলিতে পারিব না।' নুরল সক্রোধে বলিলেন, 'কেন পারিবে না? তোমাকে বলিতেই হইবে।' সালেহা ভয় পাইয়া কহিল, 'মা বলিয়াছে।'

নুরল মায়ের ঘরের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'মা, আজ আপনাকে কয়েকটি কথা বলিব। বাপজানের মৃত্যুর সময় আপনার যে ব্যবহার দেখিয়াছি, তাহাতেই মর্মে মরিয়া আছি! আপনার আচার-ব্যবহার দেখিয়া, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করি নাই। করিলে এতদিনে উৎসন্নে যাইতাম। আপনি শরিফের ঘরের মেয়ে বলিয়া সর্বদাই অহঙ্কার করেন, কিন্তু ইহা আপনার অশিক্ষার ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। বংশগৌরব কাহারও একচেটিয়া নহে। আল্লাহতায়ালা বড়-ছোট করিয়া কাহাকেও পয়দা করেন নাই। সকলের মূলেই এক আদম। তবে কার্যবশত সংসারে বড়-ছোট হইয়া গিয়াছে। আমাদের মোগল, পাঠান, শেখ প্রভৃতি শ্রেণীভাগের মূল ইহাই। ফলত বংশমর্যাদা সব দেশে, সব কালে সৎ-অসৎ কার্যফলের উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। আমরা সম্ভ্রান্ত শেখ-বংশোদ্ভব। যে বংশে আমি বিবাহ করিয়াছি তাহারাও সম্ভ্রান্ত শেখ। আপনার বাপদাদারাও বুনিয়াদি শেখ ব্যতীত

আর কিছুই নহেন। সুতরাং বংশের গৌরব করা আপনার উচিত নয়। আবার যাঁহারা ভূমির অধিপতি তাহারা ভৌমিক বা ভূঞা। আমার শ্বশুরের পূর্বপুরুষরা ভূমির অধিপতি অর্থাৎ রাজা ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাদের খেতাব হইয়াছে ভূঞা। আপনি যদি কল্পনা করিয়া এই সম্মানিত উপাধির কদর্থ করিয়া থাকেন, তবে আপনার তওবা করা উচিত।'

নুরল এসলামের কথা শুনিয়া তাহার বিমাতা ক্রোধে, অভিমানে উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, 'আমি যদি বড়ঘরের মেয়ে হই, তবে এ অপমানের প্রতিফল তোকে ভোগ করিতেই হবে। আমি কসম করিলাম, আজ হইতে তোর ভাত-পানি আমার পক্ষে হারাম। আমি কি একেবারেই মরিয়াছি যে, তোর সোহাগের বৌ-এর বাঁদী হইয়া সংসার করিব? পৃথক হইলে আমার ভাত খায় কে? কালই ভাইকে ডাকিব, তোর মুখ দোরস্ত করিব, পৃথক হইলে তবে ভাত পানি ছুঁইব।'

নুরল এসলাম কহিলেন, 'তাহাই হইবে, কিন্তু অনাহারে দুঃখ পাইবেন না; এখনও এই অন্নে আপনার অধিকার আছে।'

অতঃপর নুরল এসলাম ঘরে যাইয়া স্ত্রীকে কহিলেন, 'তুমি আর দুঃখ করিও না, এখন হইতে যদি ওঁর শিক্ষা না হয়, তবে উপায় নাই।'

আনো : আমি যে-ভয়ে আপনার নিকট আম্মাজানের কোনো কথা খুলিয়া বলি না, আপনি আমার সেই ভয় দশগুণ বাড়াইয়া তুলিলেন।

নুরল : কিসের ভয়ের কথা বলিতেছ?

আনো : উনি যেরূপ কসম করিলেন, যদি রাগের মাথায় কালই পৃথক হন, তবে দেশময় আমাদের দুর্নাম রটিবে। লোকে আমাকে বলিবে, বউটি ডাইনি, ভালো সংসার নষ্ট করিল। তখন উপায় কী?

নুরল : ন্যায়পথে থাকিলে লোকে কী বলিবে, সে ভয় আমি করি না।

আনো : না করুন, তথাপি আম্মাজানকে তিরস্কার করিয়া ভালো করেন নাই। হাজার হইলেও তিনি আমাদের গুরুজন; বিশেষত আমার জন্য তাঁহাকে অতদূর বলা ভালো হয় নাই।

নুরল : আমি তো তাঁহাকে তিরস্কার করি নাই। কেবল তাঁহার ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া উপদেশভাবে কয়েকটি কথা বলিয়াছি মাত্র।

পরদিন রবিবার পূর্বাহ্নে নুরল এসলামের বৈঠকখানায় গ্রামের গণ্যমান্য প্রধান প্রধান লোক আসিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন। বৈঠক বসিল। সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত অবস্থা জানেন, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন : 'আমরা মনে করিয়াছিলাম, দেওয়ান সাহেবের মৃত্যুর পর ছেলের সহিত তাঁহার সৎ-মা পৃথক হইবেন; কিন্তু ছেলের গুণেই এতদিন সংসারটি বাঁধা ছিল।' যাঁহারা ভিতরের অবস্থা জানেন না, তাঁহারা কহিলেন : 'পুরান সংসার, একত্র থাকাই তো ভালো ছিল, হঠাৎ এরূপ পৃথক হওয়ার কারণ কী?'

যাহা হউক, একত্র থাকার জন্য অনেকে নুরল এসলাম ও তাঁহার বিমাতাকে নানাপ্রকারে বুঝাইলেন; কিন্তু বিমাতার উৎকট জেদের ফলে বণ্টনই সাব্যস্ত হইল। অনেক বাদানুবাদের পর স্থিরকৃত হইল, নুরল এসলাম পুরান বাড়িতে থাকিবেন। পুরান বাড়ির পশ্চিমাংশে তাঁহার সৎমার বাড়ি হইবে। নূতন ঘরবাড়ি করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত নগদ আড়াইশত এবং সালেহার বিবাহের খরচ সাড়ে তিনশত, মোট ছয়শত টাকা পনেরো দিনের মধ্যে নুরল এসলামকে তাহার বিমাতার হাতে দিতে হইবে।

বণ্টনের পর বিমাতা পৃথক পাকের বন্দোবস্ত করিয়া পানি স্পর্শ করিলেন। হায়-রে জিদ!

৩ ❑ চিত্তের ভার কমিয়া গেল

পনেরো দিন পর নুরল এসলামকে ছয়শত টাকা দিতে হইবে, এই ভাবনায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হাতে যাহা ছিল, বিবাহের ব্যয়ে তাহাও নিঃশেষ হইয়াছে। তবে তিনি ঋণগ্রস্ত হন নাই—এই যা লাভ। সোমবারে তিনি চিন্তিত মনে বেলগাঁও অফিসে গমন করিলেন। আনোয়ারা পতির মনোভাব বুঝিয়া তাঁহার চিন্তা নিজ হৃদয়ে ধারণ করিল। সে মধুপুরে পত্র লিখিল।

> দাদিমা! আমার ভক্তিপূর্ণ শত সহস্র সালাম জানিবে। অনেকদিন তোমাদের পত্র পাই না, এজন্যও চিন্তিত ও দুঃখিত আছি। সত্বর তোমাদের কুশল সংবাদসহ পত্র লিখিবে। গতকল্য আম্মাজান পৃথক হইয়াছেন। তজ্জন্য আমাদের কিছু ঠেকাঠেকি হইয়াছে। পত্রপাঠ আমার নিজ টাকা হইতে ছয়শত টাকা তোমার দুলাভাইজানের নামে যাহাতে পরবর্তী সোমবার বেলগাঁও পৌঁছে, এইরূপ তাগিদে পাঠাইবে। বাপজান ও মাকে এবং ওস্তাদ চাচাজান ও চাচীআম্মাকে আমার সালাম জানাইবে। বাদশা ভাই কেমন আছে? সে স্কুলে যায় তো? ভোলার মা, গদার বৌ, মার সই—ইহাদের কুশল সংবাদ লিখিবে। আমাদের বালিকা-বিদ্যালয় কেমন চলিতেছে?
>
> ইতি
> তোমারই
> *আনার*

সপ্তাহ শেষ—শনিবার নুরল এসলাম বাড়ি আসিলেন। টাকা সংগ্রহ না-হওয়ায় তাঁহার মুখ মলিন। আনোয়ারা জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার চেহারা এত খারাপ হইয়াছে কেন?'

নুরল : আর কয়েকদিন পরেই সালেহাদিগকে টাকা দিতে হইবে, এ পর্যন্ত তাহা সংগ্রহ হইল না। ম্যানেজার সাহেব সরকারি তহবিল হইতে বিনাসুদে দুইশত দিতে চাহিয়াছেন। অবশিষ্ট টাকা কোথায় পাইব সেই ভাবনায় বড়ই চিন্তিত হইয়াছি।

আনো : মা মরণকালে আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, মা, সংসারে যত বিপদে পড়িবে, ততই খোদাকে আঁকড়াইয়া ধরিবে, বিপদ আপনাআপনি ছাড়িয়া যাইবে।

নুরল : তোমার মুখে স্বর্গীয়া আম্মার উপদেশের কথা শুনিয়া আমার মনের অবসাদ যেন নিমেষে অন্তর্হিত হইয়াছে।

আনো : আজ রাত্রিতে প্রাণ ভরিয়া কোরান শরিফ পড়িব।

আহারান্তে রাত্রিতে ধর্মশীল দম্পতি, সংকল্পিত ধর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। নুরল এসলাম বেলগাঁও যাইবেন। আনোয়ারা কহিল, আজ রাত্রিতে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, এক পরম ধার্মিক বৃদ্ধা আপনাকে অর্থাভাবে চিন্তিত দেখিয়া বলিতেছেন, বৎস চিন্তিত হইও না; তোমার প্রাপ্য কিছু টাকা আমার নিকট মওজুদ আছে, তাহা হইতে কতক টাকা তোমার সংসার খরচের জন্য দিলাম। আমার বিশ্বাস আপনি বেলগাঁও যাইয়া আজ কি কাল তাহা পাইবেন। দাসীর অনুরোধ, স্বপ্ন সফল হইলে টাকা গ্রহণে সংকোচ করিবেন না।

নুরল এসলাম খোদাভরসা করিয়া বিস্মিতচিত্তে অশ্বারোহণে বেলগাঁও রওয়ানা হইলেন। বেলগাঁও উপস্থিত হইয়া সবেমাত্র অফিসের কার্যে মনোযোগী হইয়াছেন, এমন সময় ডাকপিয়ন

যাইয়া তাঁহাকে সালাম করিয়া দাঁড়াইল এবং ব্যাগ হইতে একখানি মনি অর্ডারের ফরম বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিল। তিনি ফরম পড়িয়া দেখিলেন, ছয়শত টাকার মনিঅর্ডার। প্রেরিকা দাদিমা, গ্রাম মধুপুর। নুরল তখন স্ত্রীর স্বপ্নের অর্থ বুঝিলেন এবং খোদাতালার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

শনিবার নুরল টাকা লইয়া বাড়ি আসিলেন। আনোয়ারা টাকার ব্যাগ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, দাসীর স্বপ্ন তো বৃথা যায় নাই।

নুরল এসলাম ছয়শত টাকার তোড়া আনোয়ারার নিকটে দিলেন এবং কহিলেন, এ টাকা আমি লইব না।

আনো : কেন?

নুরল : টাকাগুলি কার?

আনো : আপনার।

নুরল : দাদিআম্মা পাঠাইয়াছেন কেন?

আনো : আপনার টাকা তাঁর কাছে মজুদ ছিল।

নুরল : বুঝিলাম না।

আনো : বাপজান যদি আমার বিবাহ বাবদ আপনার নিকট টাকা চাহিতেন, আর আপনি যদি তাহা দিতে অস্বীকার করিতেন, তবে এই বিবাহে বিঘ্ন ঘটিত। তজ্জন্য দাদিমা সংকল্প করিয়াছিলেন, আপনি টাকা দেওয়া অস্বীকার করিলে গোপনে আপনার নিকট (বাপজানকে দিবার জন্য) ইহা পাঠাইতেন। এ সেই টাকা। এই টাকা বিবাহের জন্য আবশ্যক হয় নাই, আপনার নামেই মজুদ রাখা হইয়াছিল।

আনোয়ারার সনির্বন্ধ অনুরোধে নুরল এসলাম শেষে টাকাগ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। পরদিন দুই-চারি জন সম্ভ্রান্ত প্রধানের মোকাবিলায় তিনি বিমাতাকে নগদ ছয়শত টাকা দিলেন। পত্নীর পতিপ্রাণতায় তাঁহার চিত্তের ভার কমিয়া গেল।

৪ ❑ হৃদয়ে দারুণ আঘাত

একযোগে ছয়শত টাকা হাতে পাইয়া নুরল এসলামের বিমাতা, গোপীনপুর হইতে ভ্রাতাকে আবার ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ভগ্নীপতির মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু ভগ্নী আছে, তাহার নামেই দুই হাজার টাকা কাবিনের তালুক আছে, বিবাহযোগ্যা সুন্দরী ভাগিনেয়ী আছে, তদুপরি নিজের বিবাহযোগ্য পুত্রও আছে। এইসকল উপকরণযোগে আলতাফ হোসেন সাহেব ভগ্নীর আহ্বানে অনতিবিলম্বে রতনদিয়া উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে ভ্রাতা-ভগ্নীতে নির্জনে কথোপকথন আরম্ভ হইল।

ভ্রাতা : ডাকিয়াছ কেন?

ভগ্নী : অনেক কথা আছে।

ভ্রাতা : নুরল টাকা দিয়াছে?

ভগ্নী : জি হাঁ।

ভ্রাতা : সব টাকা দিয়াছে?

ভগ্নী : জি হাঁ।

ভ্রাতা : ধাঁ করিয়া এত টাকা কোথায় পাইল? তলে তলে বুঝি অনেক টাকা পুঁজি করিয়াছিল?

ভগ্নী : তা কি আর বলিতে হইবে। তালুকের খাজনা বছরে প্রায় পাঁচ-ছয়শত টাকা, তার মাহিনা পাঁচ-ছয়শত টাকা, এত কোথায় যায়? ইচ্ছামতো খরচের জন্য একটি পয়সাও হাতে পাইতাম না। কেবল একমুঠো ভাত ও একখানি বস্ত্র।

ভ্রাতা : তাতে আর ভুল কী? আমি ভাবিয়া দুঃখিত হইতাম, তোমার থাকিয়াও নাই। যাক, পৃথক হইয়া ভালোই করিয়াছ, এখন দু পয়সা হাতে পাইবে।

ভগ্নী : ভাইজান, আমার বাড়িঘরের বন্দোবস্ত করিয়া দিন। আমাকে স্থিতি না-করিয়া আর বাড়িতে ফিরিতে পারিতেছেন না। তারপর স্থিতি হইলে সংসার কীভাবে চলিবে, তাহারও ঠিকঠাক করিয়া দিতে হইবে।

ভ্রাতা : পৃথক হওয়ার পর হইতে তোমাদের ভাবনায় রাত্রিতে ঘুম হয় না। এখন দেখিতেছি, বাড়িঘর যেন করিয়া দিলাম, এক-আধজন পুরুষ না-থাকিলে চলিবে কিরূপে? তালুকের খাজনাপত্র আদায়-হেফাজত এসবও করিতে হইবে, উপায় কী? তালুক যখন পৃথক করিয়া লওয়া হইল, তখন নুরল তোমার দিকে একেবারেই ফিরিয়া চাহিবে না।

ভগ্নী : যদি কথা রাখেন তবে বলি। আপনার খাদেম আলীকে আমি চাই, সালেহার সহিত মানানমতো হইবে।

ভ্রাতা মনে মনে হাতে স্বর্গ পাইলেন। তথাপি ভগিনীর নিকট একটু আদর জানাইয়া কহিলেন, তার মাকে একবার জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

ভগ্নী : আমি গত বৎসর আভাসে ভাবীসাহেবাকে একটু বলিয়াছিলাম; তিনি বলিলেন, 'তোমাদের ছেলে তোমরা লইবে তাহাতে আপত্তি কী।'

ভ্রাতা : তিনি রাজি হইলে আর কথা না।

ভগ্নী : খাদেমকে পাইলে আমার সবদিক বজায় থাকিবে। সে সংসার-তালুক সব দেখিবে, আমিও কুল রক্ষা করিয়া মেয়ে বিবাহ দেওয়ার দায় হইতে খালাস পাইব।

ভ্রাতা : আচ্ছা, তোমার ইচ্ছামতোই কাজ হউক।

নগদ টাকা হাতে পাইয়া আলতাফ হোসেন সাহেব বিশ-পঁচিশ দিনের মধ্যে ভগ্নীর ঘরবাড়ি প্রস্তুত করিয়া দিলেন। মহানন্দে ভগ্নী নিজবাড়িতে আসিলেন।

এখানে আসিয়া তিনি প্রস্তাবিত বিবাহ কার্যে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিলেন। জিদের বশে নুরল এসলামকে উপেক্ষা করিয়াই বিবাহের বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু নুরল এসলাম লোকপরম্পরায় যখন কথা শুনিলেন, তখন তাঁহার মহান হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল। তিনি বিমাতার ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া ও নুতন বাড়ি দর্শন উপলক্ষে তাঁহার বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। বিমাতা তাঁহাকে খানিকটা গর্বের সহিত কহিলেন : 'বাপু পায়ে ঠেলিয়াছ, কুঁড়েঘর দেখিয়া কী করিবে?' নুরল এসলাম কহিলেন, 'মা উল্টা বলিতেছেন, তা বলুন, আমি একটা কথা বলিতে আসিয়াছি, শুনুন।'

বিমাতা : কী কথা?

নুরল : শুনিলাম, খাদেমকে আপনি ঘরজামাই রাখিতেছেন?

বিমাতা : হাঁ, তাহাই তো মনে করিয়াছি।

নুরল : আমার অমতে আপনি সালেহার বিবাহ দিতে পারেন না। তবে আপনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিবেন বলিয়া পৃথক হইয়াছেন, তখন বিবাহে বাধা দিব না। তবে এ বিবাহে আমার মত নাই। বিবাহ দিলে সালেহাকে দোজখে ফেলা হইবে। কারণ, খাদেম মূর্খের মধ্যে গণ্য, বিশেষত তাহার চরিত্র মন্দ।

বিমাতা : তাহা হইলেও বড়ঘরের ছেলে তো? আর সালেহা আমার চোখের উপর থাকিবে। আমি এ বিবাহ দিবই।

নুরল বাক্যব্যয় নিষ্ফল জানিয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন।

যথাসময়ে যথাবিধি খাদেম আলীর সহিত সালেহা খাতুনের বিবাহ হইল।

৫ ❑ রৌপ্য চাকতির চাকচিক্য

বিবাহের পর ছয়মাস এইরূপে কাটিল। খাদেম আলী বিলাসপূর্ণ বেলগাঁও যাতায়াত আরম্ভ করিয়া স্বীয় দুশ্চরিত্রের পরিচয় দিতে লাগিল। টাকার অভাব হইল না। শাশুড়ির তালুকের খাজনা, বাজে খাজনা ও জোরজুলুম করিয়া সে যাহা আদায় করিত, হিসাব-নিকাশ তাহার শাশুড়িকে বড় দিত না। শাশুড়ি মনে করিয়াছিলেন, ক্ষুদ্র সংসার, তালুকের খাজনাপত্রে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে চলিয়া যাইবে; কিন্তু জামাতার গুণে তাহা চলিল না। ভগ্নী অল্পদিনের মধ্যেই ভ্রাতাকে সংসার অচল হওয়ার কথা জানাইলেন।

ভ্রাতা : ঘরবাড়ি প্রস্তুত ও ছেলেমেয়ের বিবাহখরচ বাদ তোমার হাতে এখন কত টাকা আছে?

ভগ্নী : শতখানেক পরিমাণ টাকা হইবে।

ভ্রাতা : তাহা ছাড়া তোমার নিজ তহবিল কিছু নাই কি?

ভগ্নী : অনেক দুঃখ-কষ্ট করিয়া হাজারখানেক টাকা রাখিয়াছিলাম।

ভ্রাতা : তুমি ঐ টাকা হইতে সাতশত টাকা আমার হাতে দাও। বেলগাঁও নূতন উন্নতশীল বন্দর হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু জুতার দোকান একটিও নাই, বড়ই সুযোগ। হাজার-বারো শত টাকার একটি জুতার দোকান খুলিয়া দেই। খাদেম আমার দুইবার ইংরেজি পরীক্ষা দিয়াছে। সে চাকরবাকর রাখিয়া স্বচ্ছন্দে দোকান চালাইতে পারিবে।

ভগ্নী : ইহাতে কত লাভ হইবে?

ভ্রাতা : তোমার সাতশত টাকা মজুতই থাকিবে। তাহা হইতে মাসে মাসে সত্তর-আশি টাকা লাভ দাঁড়াইবে। দোকান ক্রমে বড় হইলে আরও বেশি লাভ হইবে। ফল কথা, সাহেবের গোলামি করিয়া নুরল ইসলাম যাহা রোজগার করে, এ-কার্যে তাহার অপেক্ষা বেশি লাভ হইবে। লাভের টাকাতেই তোমাদের খুব স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে তালুকের টাকা তুমি সিন্দুকে তুলিতে পারিবে।

সতীনের ছেলের অপেক্ষা জামাতা বেশি উপার্জন করিবে শুনিয়া ভগিনী ভ্রাতার হাতে তখনই সাতশত টাকা গণিয়া দিলেন।

আড়ম্বরসহকারে বেলগাঁও বন্দরে জুতার দোকান খোলা হইল। খাদেম আলী দোকানের সর্বেসর্বা হইল। ক্রয়-বিক্রয় প্রথম প্রথম খুবই চলিতে লাগিল। নগদ মুদ্রা ঝনাৎ-ঝন-ঝনাৎ শব্দে তাহার সম্মুখে আসিতে লাগিল। নবীন যুবকের বিকৃতমস্তিষ্ক রৌপ্য চাকতির চাকচিক্যে একেবারে বিগড়াইয়া গেল।

৬ ❑ ইয়ারগণ

খাদেম আলীর সুখসম্পদের সময় তাহার আর ৩/৪টি নূতন ইয়ার জুটিল। ইয়ারগণ তাহার সমবয়স্ক নবীন যুবক। প্রায় সকলেই ধনীর সন্তান, সকলেই পিতামাতার অন্যায় আব্দারে, অনুচিত বাৎসল্যে লালিত পালিত—আদরের পুতুল। বিলাসব্যসন ও ইন্দ্রিয়সেবা ইহাদের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য। ইহারা না-পারে এমন দুষ্কার্য ছিল না। ইন্দ্রিয়পরায়ণ খাদেম আলীর অর্থোন্নতি দেখিয়া পাপিষ্ঠেরা ঘন ঘন তাহার দোকানে যাতায়াত আরম্ভ করিল। ক্রমে তাহারা খাদেম আলীকে নিজ দলে টানিয়া লইল। ক্রমে তাহাদের সহিত খাদেম আলীর অকৃত্রিম হৃদ্যতা জন্মিয়া গেল।

এই সময় একদিন ইয়ারদল, খাদেম আলীর দোকানে বসিয়া তাহাকে বিশেষভাবে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, ভাই খাদেম ! মিঠাই খেয়ে খেয়ে নাড়িতে ময়লা ধরিয়াছে। তোমার নূতন দোকানে নূতন রোজগার, আজ রাত্রিতে দোকানে তোমাকে পোলাওয়ের ভোজ দিতে হইবে।

রাত্রিতে মোরগ-পোলাওয়ের দাম দেওয়া হইল। দোকানঘরের প্রকোষ্ঠে পাক ও পানাহার শেষ করিয়া ইয়ারগণ গানবাজনা গল্পগুজব আরম্ভ করিল। কথাপ্রসঙ্গে আব্বাস আলী কহিল, 'আচ্ছা তোমরা এযাবৎ যত স্ত্রীলোক দেখিয়াছ, তাহার মধ্যে কাহাকে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বলিয়া জানো?' আব্বাস আলীর কথায় ইয়ারগণ খুশি হইয়া স্ব স্ব মত ব্যক্ত করিতে লাগিল। গণেশ কহিল, : 'বেশ কথা তুলেছ হে আব্বাস, তোমাকে ধন্যবাদ। এমন না হলে তোমাকে দলপতি বলে মানে কোন শালা?'

সমসের গণেশের গা ঘেঁষিয়া বসিয়াছিল, সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বলো সমসের তোমারি মত আগে শুনা যাক্।'

সমসের : আমাদের পাড়ায় আলী মামুদের মেয়ে জমিলা।

করিম : না না, রামজয় ঘোষের বউ।

গণেশ : 'এ সবচেয়ে বেশি সুন্দরী, আমাদের জগত্তারণ বাবুর ভগ্নী নিস্তারিণী ঠাকুরানী। আহা, বল্‌ব কী, এমন সুন্দরী তোমাদের দুনিয়ায় নাই হে।'

সর্বশেষে খাদেম আলী কহিল, 'তোমরা যদি কারো কাছে না বলো, আমি একটি যুবতীর কথা জানি, তাঁর মতো সুন্দরী এদেশে আর নাই। তাঁর মাথার চুল পায়ে ঠেকে, শরীরের বর্ণ কাঁচা হরিদ্রার মতো।' সকলেই তখন দম ধরিয়া খাদেমের মুখের দিকে চাহিল। সে পুনরায় কহিল, 'তোমরা বলবে না তো?' সমস্বরে উত্তর হইল : 'না, না, না।' খাদেম তথাপি অনুচ্চস্বরে ভয়ে ভয়ে কহিল, 'আমাদের নুরুল এস্‌লাম ভাইয়ের স্ত্রী।' সকলে শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। শেষে আব্বাস কহিল, 'তোমার সঙ্গে কথাবার্তা চলে তো?'

খাদেম : 'আমি তাঁকে এ পর্যন্ত দেখি নাই।'

সকলে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। আব্বাস হাসির স্বরেই কহিল, 'এক বাড়িতে থাকো, অথচ তাঁকে দেখ নাই, কেমন কথা হে? বিশেষত তুমি তাঁর নন্দাই।'

খাদেম : বাড়ি একই বটে, কিন্তু পৃথক আঙিনা। ভাই সাহেবের আঙিনায় আঁটাপেটা উঁচু বেড়া, চাঁদ-সূর্য প্রবেশের যো নাই। বিশেষত তাঁহার সহিত আমাদের বনিবনাও নাই। যাওয়া-আসা একরূপ বন্ধ।

আব্বাস : তোমার স্ত্রীও কি সে আঙিনায় যায় না?

খাদেম : সে মাঝে মাঝে যায়। আমি তারই মুখে একদিন শুনিয়াছি।

আব্বাস : তারই সাহায্যে একদিন দেখিবার উপায় করিতে পারো না?

বেলগাঁও অঞ্চলে আব্বাসের পিতার খুব নামডাক, মান সম্ভ্রম; অবস্থাও খুব ভালো। কেবল তেজারতি কারবারে ৬/৭ লাখ টাকা খাটে, ৩০/৩১টি গোলাবাড়িতে বিভিন্ন জেলায় তাঁহার ধান চাল পাটের ব্যবসায় চলে; এতদ্ব্যতীত কিছু ভূসম্পত্তিও আছে। আব্বাস আলী পিতামাতার অতিসোহাগের একমাত্র সন্তান, গ্রাম্যস্কুল পাঠশালায় পড়িয়া তাহার বিদ্যা সাঙ্গ হইয়াছে। যৌবনের প্রারম্ভে সংসর্গ-দোষে তাহার এইরূপ মতিগতি।

খাদেম আলী বাড়ি আসিয়া রাত্রিতে অনেক সাধ্যসাধনায় সালেহাকে বশ করিল। অনন্তর তাহার সাহায্যে পরদিন নুরল এসলাম সাহেবের স্ত্রীকে দেখিল। তার পরদিন দোকানে গিয়া আব্বাসের নিকট কহিল, 'ভাই, এমন চিজ আর কখনো দেখি নাই। স্ত্রীলোক যে এমন খুবছুরত থাকিতে পারে তাহা আগে জানিতাম না। সত্যই বলিতেছি, এমন রূপসী এদেশে কেন, এ পৃথিবীতে নাই! সাক্ষাৎ বেহেস্তের হুরী। আমি দেখিয়া বেহুঁশ হইয়াছিলাম, আল্লা মেহেরবান তাই রক্ষা।'

আব্বাস দম বন্ধ করিয়া শুনিতেছিল, কিন্তু পারা কঠিন।

আব্বাস : কেন? তুমি কিরূপে দেখিলে।

খাদেম : আমার স্ত্রীর নিকটে দেখার কথা পাড়াতে সে কহিল 'চাঁদ সূর্য তাঁর মুখ দেখতে পায় না, আপনি দেখবেন কিরূপে? তবে রোজ যদি বাড়ি আসেন, তবে কলাকৌশলে একদিন দেখাইতে পারি।'

আব্বাস : ভাই খাদেম, তুমি আমার হৃদয়বন্ধু। তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ঐরূপ করিয়া একটিবার দেখাও।

খাদেম কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, 'তবে আমাকে পুনরায় আজ বাড়ি যাইতে হইবে।' আব্বাস আলী কহিল, 'ভাই খাদেম, যতবার ইচ্ছা বাড়ি যাও, যেমন করিয়া চালাইতে হয়, আমি তোমার দোকান চালাইব। দেখ, গত তিনদিনে তোমার চেয়ে অনেক বেশি বিক্রয় করিয়াছি।'

খাদেম বৈকালে বাড়ি গেল। পরদিন দোকানে আসিয়া কহিল, 'ভাই আব্বাস, তোমার জোর কপাল; হুরীদর্শনের শুভযোগ উপস্থিত। অদ্য ভাইসাহেব কলিকাতা যাইবেন, বৈকালে আমরা দুজন আমাদের বাড়িতে যাইব। তারপর নির্ভাবনায় তোমাকে হুরী দেখাইব।'

অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যভাগে নুরল এসলাম কোম্পানির কার্যে কলিকাতা গমন করিলেন। পরামর্শানুযায়ী বৈকালে আব্বাস ও খাদেম রতনদিয়া উপস্থিত হইল। ঘন ঘন বাড়ি আসায় সালেহার স্বামীভক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। খাদেম স্ত্রীর সাহায্যে, নুরল এস্‌লাম সাহেবের স্ত্রীকে দেখার সময় ঠিক করিয়া, আব্বাস আলীর সহিত যথাসময়ে পূর্বকথিত বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিল। আব্বাস আলী নিঃশব্দে আড়ার উপর উঠিয়া বসিল। বাঞ্ছিতরত্ন নয়নগোচর হওয়ায়, আব্বাস সঘননিশ্বাসে কাঁপিতে লাগিল। খাদেম দেখিল আব্বাস পড়িয়া যায়; এজন্যে সে আব্বাসকে দেওয়ালের কাঠ চাপিয়া ধরিতে ইঙ্গিত করিল। আব্বাস তাহাই করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নামিয়া আসিয়া উভয়ে খাদেমের নূতন বৈঠকখানায় যাইয়া উপবেশন করিল। অতঃপর কথা আরম্ভ হইল।

খাদেম : কেমন দেখলে?

আব্বাস : বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। তুমি কিরূপ দেখিয়াছিলে?

খাদেম : ভাবী উত্তরমুখে চৌকির উপর বসিয়া আছেন, তাঁর চুলগুলি কাঠের আলনায় রুপার দাঁড়ে করিয়া রৌদ্রে ছড়ানো রহিয়াছে।

আব্বাস : 'আমিও প্রথমে সেইরূপ অবস্থায় দেখিলাম, শেষে তিনি চুলগুলি গোছাইয়া দক্ষিণমুখে বাগানের দিকে তাকাইলেন। তার চুল প্রায় মৃত্তিকা স্পর্শ করিল। ওই সময়ে আমি তাঁহাকে দেখিয়া অবশ হইয়া কাঁপিতেছিলাম। তুমি কাঠ ধরিতে ইশারা না-করিলে, আমি ধপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইতাম। ভাই খাদেম, তোমার সেইদিনের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বাস্তবিক স্ত্রীলোক যে এত সুন্দর আছে, জানি না। আরব্যোপন্যাসে অনেক সুন্দরী স্ত্রীলোকের অদ্ভুত কাহিনী পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এমন রূপ, এমন চুলের কথা কোথাও পাই নাই।

খাদেম : নুরল এসলাম ভাইয়ের জীবন সার্থক, এমন রত্ন লাভ করিয়াছেন।

আব্বাস : ভাই খাদেম, এ রত্ন যে স্পর্শ করে নাই, তার জীবন বৃথা।

খাদেম একটু দম ধরিয়া কহিল, 'হাজার টাকা ব্যয় করিলেও পারবে না।'

আব্বাস : পাঁচ হাজার?

খাদেম : ও কথাই বলিও না।

আব্বাস : ভাই কথায় বলে, টাকায় বাঘের চোখ মেলে। টাকায় কী না-হয়?

৭ ❑ এক বৈষ্ণবী

নুরল এসলামের কলিকাতা যাইবার চারিদিন পরে এক বৈষ্ণবী রাধাকৃষ্ণ বলিয়া তাঁহার বাড়ির উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। বৈষ্ণবীর কপালে, কণ্ঠে ও বাহুতে হরিনামের তিলক কাটা, গায়ে নামাবলি, কাঁধে কন্থার ঝুলি, মাথার চুল উর্ধ্বমুখে খোঁপা করা।

এই সময় আনোয়ারা দক্ষিণদ্বারী ঘরের দাওয়ায় তাহার ফুফুশাশুড়ির নিকট বসিয়া, দাসীর ব্যবহারের জন্য একটি বালিশের খোল সেলাই করিয়া দিতেছিল। তাহার সরলা ফুফুশাশুড়ি বৈষ্ণবীকে দেখিয়া কহিলেন : কি গো, তোমাকে যে অনেকদিন পরে দেখিলাম?

বৈষ্ণবী : মা, দুই বৎসর নবদ্বীপে ছিলাম, অল্পদিন হইল দেশে আসিয়াছি, এখন ঘন ঘন দেখিবেন। আপনাদের দুয়ারে না আসিলে কি আমাদের উপায় আছে?

ফুফুশাশুড়ি দাসীকে ভিক্ষা দিতে ডাকিলেন, কোনো উত্তর পাইলেন না। আনোয়ারা তখন সেলাই রাখিয়া ভাণ্ডারঘর হইতে ভিক্ষা আনিয়া বৈষ্ণবীর সম্মুখে রাখিল। বৈষ্ণবী আনোয়ারার আপাদমস্তক বিস্ময়-বিস্ফারিত তীব্রদৃষ্টিতে সতর্কতার সহিত দেখিয়া লইল এবং ফুফুশাশুড়িকে লক্ষ করিয়া কহিল : মা, ইনি কে?

ফুফু : ছেলের বৌ।

বৈষ্ণবী : সিঁথির সিন্দুর অক্ষয় হউক।

আনোয়ারার কপালে সিন্দূর ছিল না। মুসলমান মহিলাগণ সিন্দূর ব্যবহার করেন না। বৈষ্ণবীর এইরূপ উক্তি তাহার বাঁধা গদ। অতঃপর সে ভিক্ষা লইয়া প্রস্থান করিল।

বৈষ্ণবীর নাম দুর্গা। তাহাকে দুর্গার মতো সুন্দরী দেখাইত বলিয়া তাহার পৈতৃক গুরুদেব দুর্গা নাম রাখিয়াছিলেন।

৮ □ নুরল এসলাম পীড়িত

নুরল এসলাম তিন সপ্তাহ পর বাড়ি আসিলেন। তাঁহার চেহারা মলিন, গলার আওয়াজ বসা। দেখিয়া আনোয়ারার প্রফুল্ল মুখ শুকাইয়া গেল। সে বিষাদস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'অমন হইয়াছেন কেন? শরীর যে মাটি হইয়াছে।'

নুরল : কয়েক দিন শীতে ভুগিয়া সর্দি ধরিয়াছে। সর্দিতে গলার আওয়াজ বসিয়া গিয়াছে। আবার গতকল্য গাড়িতে উঠিতে বুকে আঘাত লাগিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি। আজ যেন একটু জ্বর-জ্বর বোধ হইতেছে।

আনো : আর অফিসে যাইয়া কাজ নাই, শরীর সুস্থ না-হওয়া পর্যন্ত আপাতত দুই সপ্তাহের ছুটি নিন।

নুরল : আচ্ছা, কাল প্রাতে দেখা যাইবে।

রাত্রিতে নুরল এসলামের জ্বর একটু বেশি হইল। তিনি খুকখুক করিয়া কাশিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে দেখা গেল, তাঁহার গলার স্বর আরও বসিয়া গিয়াছে, কাশির সঙ্গে রক্ত উঠিয়াছে। রক্ত দেখিয়া আনোয়ারার আত্মা চমকিয়া গেল। নুরল এসলাম ছুটির আরজির সহিত ম্যানেজার সাহেবকে লিখিলেন : অনুগ্রহপূর্বক আমার জন্য এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনবাবুকে পাঠাইবেন। রাত্রিতে জ্বর হইয়াছে এবং কাশির সহিত গলা দিয়া রক্ত উঠিয়াছে।

পত্র লইয়া বাড়ির চাকর বেলগাঁও গেল। এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন আসিলেন ও দেখিয়া ঔষধ দিয়া ভিজিট লইয়া চলিয়া গেলেন। ম্যানেজার সাহেব এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনকে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নুরল এসলামকে কেমন দেখিলেন?'

এ সা : অবস্থা ভালো নয়। ক্ষয়কাশের পূর্বলক্ষণ বলিয়া বোধ হইল।

সাহেব শুনিয়া দুঃখিত হইলেন।

ইহার এক সপ্তাহ পরে দুর্গা বৈষ্ণবী পুনরায় নুরল এসলামের বাড়িতে ভিক্ষার নিমিত্ত উপস্থিত হইল। সে দাসীর মুখে শুনিল, নুরল এসলাম কলিকাতা হইতে পীড়িত হইয়া বাড়ি আসিয়াছেন।

নুরল এসলামের পীড়ার প্রথম হইতেই আনোয়ারার অর্ধাশন, অনিদ্রা আরম্ভ হইল। সে ফুফুশাশুড়ির হস্তে সাধারণ পাকের ও গৃহস্থালির অন্যান্য বিষয়ের ভার ন্যস্ত করিয়া স্বামীর শুশ্রূষায় আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিল। সে স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার পার্শ্ব পরিবর্তন ও নিশ্বাস ত্যাগ গণিতে লাগিল। আদেশ শ্রবণে কর্ণকে সতর্ক করিয়া রাখিল। পথ্য, রন্ধন, ঔষধ সেবন প্রভৃতি কার্য নিজহাতে অতি সাবধানে করিতে লাগিল। কিন্তু দিন যতই যাইতে লাগিল, নুরল এসলামের পীড়া ততই বাড়িয়া চলিল। আনোয়ারা হতাশমনে তীরবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় সে পীড়া নিজ হৃদয়ে অনুভব করিতে লাগিল। সে থাকিয়া থাকিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে : আপনার কেমন বোধ হইতেছে? কী করিলে শান্তি পাইবেন বলুন, আমি তাহাই করিতেছি।

নুরল এসলাম স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলেন, 'অদৃষ্টে বুঝি আর শান্তি নাই।' শুনিয়া বুক ভাঙিয়া গেলেও আনোয়ারা স্বামীর সাহস ও ধৈর্যাবলম্বনের নিমিত্ত অশ্রুসংবরণ করিয়া বলে, 'সে কী কথা! এই তো শীঘ্রই ভালো হইবেন।'

নুরল এসলাম ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া একেবারে শয্যাশায়ী হইলেন। আনোয়ারা অনন্যোপায় হইয়া প্রিয় সখী হামিদাকে জেলার ঠিকানায় পত্র লিখিতে বসিল। চোখের পানিতে তাহার পত্র ভিজিয়া গেল। সে আর্দ্র কাগজেই লিখিল : সই, তোমার সয়া গুরুতর পীড়িত, পত্রপাঠ সয়াকে দেখিতে পাঠাইবে।

৯ ❑ বন্ধুগৃহে বন্ধু

শনিবার অপরাহ্নে আট বেহারার একখানি পালকি নুরল এসলামের বৈঠকখানার সম্মুখে আসিয়া থামিল। একজন নবকান্তি চশমাধারী যুবক পালকি হইতে বাহির হইয়া বৈঠকখানায় গিয়া বসিল এবং তথায় অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর বাটিস্থ জনৈক দাসীর আহ্বানে বাটির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইনি হামিদার স্বামী, জজকোর্টের উদীয়মান উকিল—মীর মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন।

উকিলসাহেব বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলে আনোয়ারা পতির নিকট হইতে খিড়কির দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পাকের আঙিনায় চলিয়া গেল। উকিলসাহেব ঘরে প্রবেশ করিলেন। ফুফুআম্মা মাথায় কাপড় দিয়া দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বন্ধু, বন্ধুর চেহারা দেখিয়া মর্মাহত হইলেন। বন্ধুদর্শনে পীড়িত বন্ধুর চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি অস্পষ্টস্বরে কহিলেন : 'দোস্ত আর বাঁচিবার আশা নাই, অভাগিনী আনোয়ারা রহিল, দেখিও।' উকিলসাহেব নিজ চক্ষের পানি অতিকষ্টে সংবরণ করিয়া নিজে দোস্তের চোখের পানি মুছাইয়া দিলেন এবং আশ্বাস দিয়া কহিলেন : এর অপেক্ষা কঠিন পীড়ায় লোকে আরোগ্যলাভ করে, খোদার ফজলে তুমি সত্বর আরাম পাইবে।

উকিলসাহেব সমস্ত অবস্থা শুনিয়া কহিলেন, 'এ পীড়ার ডাক্তারি ঔষধের ভালো ফল হইবে না, কবিরাজিমতে চিকিৎসা করিতে হইবে। আমি এখনই বাসায় গিয়া কাল ভোরে তথাকার বড় কবিরাজকে পাঠাইব, আল্লার ফজলে তাঁহার ঔষধে ভালো ফল হইবে। আমি মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইব, আপনারা চিন্তিত হইবেন না।'

১০ ❑ স্বামীর আরোগ্য কামনা

ইতিমধ্যে দুর্গা পুনরায় ভিক্ষাচ্ছলে নুরল এসলামের বাড়িতে আসিল। দাসী তাহাকে ভিক্ষা আনিয়া দিল। আনোয়ারাকে না-দেখিয়া দুর্গা দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমাদের বৌঠাকুরানীকে তো দেখি না?' দাসী কহিল, 'দেওয়ান সাহেব পীড়িত হওয়ার পর তিনি সর্বদা তাঁহার নিকটে থাকেন।'

দুর্গা : দেওয়ান সাহেবের কী ব্যারাম?

দাসী : জ্বর, কাশ ও গলায় আওয়াজ বসা।

দুর্গা : কে চিকিৎসা করেন?

দাসী : কদরের বড় ডাক্তার।

দুর্গা কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিল, তারপর চলিয়া গেল। এই সময়ে আনোয়ারা শয়নঘরে স্বামীকে নিজহাতে তুলিয়া পথ্য সেবন করাইতেছিল।

দুর্গা পথে যাইতে যাইতে চিন্তা করিতে লাগিল, একবার কথাবার্তা ধরাইতে পারিলে বুঝিতে পারিতাম, আমার জাদুর শিকারের গতি কোন দিকে।

উকিলসাহেব বাসায় যাইয়া, অতি প্রত্যূষে শহরের বড় কবিরাজ বিষ্ণুপদ কবিভূষণ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বন্ধু নুরল এসলামের পীড়ার অবস্থা জানাইয়া তাঁহাকে রতনদিয়ায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। কবিরাজ মহাশয় উকিলসাহেবকে কহিলেন, আমি মফস্বলে বড় যাই না, বিশেষত আমার তিলমাত্র অবসর নাই।

উকিলসাহেব কহিলেন, 'তবে কি আমরা গরিব মানুষ আপনার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইব?'

কবিরাজ মহাশয় উকিলসাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন : আচ্ছা তবে আপনার অনুরোধে স্বীকৃত হইলাম। আমার ভিজিটের কথা বোধহয় আপনি জানেন? মফস্বলে দৈনিক পঞ্চাশ টাকা।

উ : রোগী গরিব, টাকা আমাকে দিতে হইবে। অনুগ্রহপূর্বক দৈনিক তিরিশ টাকা করিয়া স্বীকার করুন, কৃতজ্ঞ থাকিব।

কবি : পালকিভাড়া ও ঔষধের দাম পৃথক লাগিবে—অবশ্য জানেন।

উ : আমার আট বেহারার পালকি আছে; তাহাতেই যাতায়াত করিবেন।

কবিরাজ মহাশয় মুখখানি একটু ছোট করিলেন; কারণ পালকিভাড়া দ্বিগুণ চার্জ করিয়া অর্ধেক টাকায় কাজ সারিতেন, তাহা হইল না। উকিলসাহেব পঞ্চাশ টাকার একখানি নোট কবিরাজ মহাশয়ের হাতে দিয়া কহিলেন, 'এখনই পালকি পাঠাইতেছি, আপনি এই বেলাতেই যাইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন। অবস্থা বুঝিয়া দুই-একদিন থাকিতে হইলেও থাকিয়া আসিবেন।' কবিরাজ মহাশয় সম্মত হইলেন।

কবিরাজিমতে চিকিৎসা আরম্ভ হইল। নুরল এসলাম প্রথমত অনেকটা সুস্থ হইলেন। তাঁহার জ্বর ও স্বরভঙ্গ কমিয়া আসিল, কাশির সঙ্গে রক্ত উঠা বন্ধ হইল। তিনি ক্রমে শয্যায় উঠিয়া বসিলেন, যষ্টিভরে ক্রমে ক্রমে দুই-এক পা করিয়া হাঁটিতে লাগিলেন। আনোয়ারা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

একদিন নুরল এসলাম স্ত্রীকে কহিলেন : অনেকদিন হয় গোসল করি নাই, নামাজও কাজা হইতেছে; আজ আমাকে গোসল করাও, প্রাণ ভরিয়া নামাজ পড়িব।

স্ত্রী : কবিরাজকে না-জিজ্ঞাসা করিয়া গোসল করিবেন?

নুরল : কবিরাজ তো বলিয়াছেন গরম জলে স্নান করিতে পারেন।

আনোয়ারা পানি গরম করিয়া স্বামীকে গোসল করাইল। পুষ্টিকর লঘুপাক খাদ্যাদি নিজহাতে প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইল। প্রথমবেলা একরূপ কাটিল। কিন্তু হায়! অপরাহ্ণে নুরল এসলামের গা গরম হইয়া উঠিল, রাত্রিতে কাশি বৃদ্ধি পাইল। তিনি পুনরায় পূর্ববৎ কাতর হইয়া পড়িলেন। পুনরায় কবিরাজ আসিলেন, ঔষধ চলিতে লাগিল।

আনোয়ারা স্বামীর পীড়ার আরম্ভকাল হইতেই, নামাজ অন্তে তাঁহার আরোগ্য কামনায় মাথা কুটিয়া মোনাজাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল : আমি জ্ঞানহীনা মূঢ়মতি বালিকা, আজ আমাকে তোমার প্রকাশিত সমুদয় নাম ধরিয়াই ডাকিতেছি। আঁধারে থাকিয়া ডাকিতেছি বলিয়া কি প্রার্থনা শুনিবে না? হে রহিম-রহমান। তুমি তো সকলই জানো, স্বামীর আরোগ্য কামনা জন্য আমার হৃদয়ভাব তুমি তো বুঝিতেছ, দেখিতেছ, তবু কেন প্রার্থনা শুনিবে না?

আনোয়ারা কায়মনোবাক্যে এইরূপ প্রার্থনা শেষ করিয়া স্বামীর গায়ে হাত বুলাইত।

১১ ❑ পুনরায় সেই বৈষ্ণবী

মাসাধিক পর একদিন অপরাহ্ণে দুর্গা আবার নুরল এসলামের বাড়িতে ভিক্ষার ভাবে উপস্থিত হইল। সেদিন দেখিল, আনোয়ারা পশ্চিমদ্বারী ঘরে আসরের নামাজ অন্তে হাত তুলিয়া মোনাজাত করিতেছে। তাহার নেত্রদ্বয় হইতে অবিরাম অশ্রু ঝরিতেছে। দুর্গা আনোয়ারার এমন অবস্থা দেখিয়া দ্বারের চৌকাঠের ওপর বসিল। আনোয়ারা অনেকক্ষণ পর মোনাজাত শেষ করিয়া চোখের পানি মুছিয়া পাশ ফিরিয়া বসিতেই দেখিল, সম্মুখে দুর্গা। দুর্গা কহিল : 'মা,

কাঁদিতেছেন কেন?' দুর্গার কথা আনোয়ারার কানে ভালো লাগিল না, সে ঘর হইতে উঠিয়া গেল। রান্নার আঙিনায় যাইয়া দাসীকে আদেশ করিল, 'বৈষ্ণবীকে ভিক্ষা দিয়া বলো, ও যেন এ বাড়িতে আর না আসে।' দাসী ভিক্ষা দিয়া দুর্গাকে কহিল, 'তুমি এ বাড়িতে আর আসিও না।'

দুর্গা রাগে গরগর করিতে করিতে চলিয়া গেল এবং পথে বলিতে বলিতে যাইতে লাগিল : কত রূপসী দেখিয়াছি, এমন বদ দেমাগী তো কোথাও দেখি নাই, যেন কত নবাবের কন্যা, ঘেন্নায় কথা কন না।

দুর্গার কথা আর কেহ শুনিল না, কেবল সালেহার মার কানে গেল। তিনি প্রাচীরের আড়ালে থাকিয়া দুর্গাকে ইশারায় ডাকিলেন। সে সালেহাদিগের আঙিনায় ঢুকিয়া পড়িল। সালেহার মা তাহাকে আদর করিয়া বসিতে দিয়া কহিলেন, 'তুমি অমন বকাবকি করিতেছ কেন?'

দুর্গা : মা, আমরা দশ দুয়ারে মাগিয়া খাই, তা ও-বাড়ির বউ আমাকে ভিক্ষা দিবে না বলিয়া জবাব দিয়াছে।

সালেহার মা : বউকে তুমি কী বলিয়াছিলে?

এই সময় সালেহা সেখানে আসিল।

দুর্গা : তাহার স্বামী কিসে সারিবে আমি তাহাই বউটিকে বলিতে গিয়াছিলাম, তা কালের দোষ। ভালো করিতে গেলে লোকে মন্দ বুঝে। আমাকে বউটি তাহাদের বাড়ি যাইতে নিষেধ করিয়াছে।

সালেহা : তোমরা যাহাই বলো, অমন ভালো বউ কোথাও নাই। অমন মিষ্টি কথা আর কোনো মেয়েলোকের মুখে শুনি নাই।

সালেহার মা চোখ রাঙাইয়া কহিলেন : দ্যাখ বজ্জাতের বেটি, তোর যে বড়ই বাড়াবাড়ি দেখিতেছি।

মেয়ে চুপ করিল। দুর্গা বিদায় হইল।

১২ □ বৈষ্ণবীর ছলনা

যেদিন আনোয়ারা দুর্গাকে তাড়াইয়া দেয়, তার পরদিন সালেহা সকালবেলা চুপে চুপে নুরল এসলামের আঙিনায় গেল, তখন আনোয়ারা রান্নাঘরের আঙিনায় উপস্থিত ছিল।

সালেহা : ভাবী, ভাই সাহেব কেমন আছেন?

আনোয়ারা : পূর্বের ন্যায়, কিন্তু কাশি একটু বাড়িয়াছে।

সালেহা : কাল বিকালে যে বৈষ্ণবী আপনাদের আঙিনায় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল, তাহাকে আপনি তাড়াইয়া দিয়াছেন কেন?

আনোয়ারা : (সালেহার মুখের দিকে চাহিয়া) তুমি কিরূপে জানিলে?

সালেহা : সে আমাদের বাড়িতে বলিয়া গিয়াছে।

আনোয়ারা : তাহার কথা ও ভাবভঙ্গি আমার নিকট ভালো বোধ হইল না।

সালেহা : আপনি তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া ভালো করেন নাই।

আনোয়ারা : কেন?

সালেহা : সে কহিল, ভাইজানের ব্যারাম ডাক্তার-কবিরাজের ঔষধপত্রে আরাম হইবে না, যাহাতে আরাম হইবে সে তাহা জানে।

আনোয়ারা : বদ স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিতে আছে?

সালেহা : ফকির বৈষ্ণব কাহার মধ্যে কী গুণ আছে বলা যায় না। মামুজানের মুখে শুনিয়াছি, ঠাকেঠিকে দুনিয়া। হয়তো ঐ বৈষ্ণবীর ঔষধপত্রে ভাইজান আরামও হইতে পারেন।

আনোয়ারা ভাবিতে লাগিল, সালেহা তো মন্দ কথা বলিতেছে না। বৈষ্ণবীই-বা মন্দ কথা কী বলিয়াছে? দাদিমাও বলিতেন, ঠাকেঠিকে দুনিয়া। ফকির-সন্ন্যাসীকে অবজ্ঞা করিতে নাই। গোলেস্তায় পড়িয়াছি, সামান্য ঝিনুকে মতি থাকে, লতাগুল্মেও সিংহ বাস করে। বৈষ্ণবী সালেহার কাছে বলিয়াছে, যাহাতে ব্যারাম সারে তাহা আমি জানি। বহু দেশে ঘোরে, অনেক জানাশুনা থাকিতে পারে; সুতরাং তাহার ঔষধে রোগ সারিবে বিচিত্র কী? এইরূপ চিন্তা করিয়া আনোয়ারা সালেহাকে বলিল : বুবু, সত্যই কি বৈষ্ণবী তোমার ভাইজানের পীড়ার ঔষধ জানে বলিয়াছে?

সালেহা : আমি কি আপনার নিকট মিথ্যাকথা বলিতেছি?

আনোয়ারা : তবে তো বৈষ্ণবীর ওপর রাগ করিয়া ভালো করি নাই। এখন তাহাকে পাইবার উপায় কী?

সালেহা : আপনি যখন তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, তখন সে বিনা ডাকে আসিবে বলিয়া বোধ হয় না।

আনোয়ারা : কাহাকে দিয়া ডাকাইব?

সালেহা : আচ্ছা, আমি চেষ্টা করিয়া দেখি।

আনোয়ার : বুবু, তোমার পায়ে পড়ি, সে যাহাতে আসে অবশ্য তাহাই করিবে।

বৈষ্ণবীকে তাড়াইয়া দিয়া সে যারপরনাই অন্যায় কার্য করিয়াছে বলিয়া মনে করিল এবং তজ্জন্য অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল।

১৩ ❑ জীব সঞ্চার ব্রত

বিধাতা বুঝি সতীর সাধনায় কর্ণপাত করিলেন না। পতি ক্রমশ মৃত্যুর নিকটবর্তী। বৈষ্ণবীকে তাড়াইয়া দেওয়াতে বুঝি স্বামীর পীড়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। এবার সে আসিলে তাহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিব, স্বামীর আরোগ্যহেতু সে যাহা বলিবে তাহা শুনিব। সালেহা বলিয়া গিয়াছে, আমি তাহার আসিবার উপায় করিব। সে কি কোনো উপায় করিতে পারে নাই? হায়। বৈষ্ণবী বুঝি আর আসিবে না। কেন তাহাকে আসিতে নিষেধ করিয়াছি? তাহার ঔষধে বুঝি স্বামী আমার নিরাময় হইতে পারিতেন। কী সর্বনাশ করিয়াছি। নিজদোষে পতির মৃত্যুর কারণ হইলাম। ভাবিতে ভাবিতে বালিকার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পর চোখের জল মুছিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, আজ আপনার কেমন বোধ হইতেছে? নুরল এসলাম কহিলেন, কিছু বুঝি না। আনোয়ারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আগ্রহের সহিত স্বামীর পদে হাত বুলাইতে লাগিল; এমন সময় রাধাকৃষ্ণ বলিয়া দুর্গা নুরল এসলামের আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াইল। আনোয়ারা বৈষ্ণবীর গলার আওয়াজ শুনিয়া ধীরে ধীরে তখন বাহিরে আসিল এবং দুর্গাকে দেখিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল।

প্রথমদিন ভিক্ষা দিতে যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করাও আবশ্যক মনে কর নাই, দ্বিতীয়বার যাহার কথা শুনিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়া যাহাকে বাড়ির ওপর আসিতে পর্যন্ত নিষেধ করিয়াছিলে,

আজ তাহার কণ্ঠস্বর মাত্র শুনিয়া বাহিরে আসিলে, দেখিয়া হাতে স্বর্গ পাইলে; পতির প্রাণরক্ষায় উন্মাদিনী তুমি।

আনোয়ারা দুর্গাকে রন্ধনশালার দিকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

দুর্গা : মা, ডাকিয়াছেন কেন?

আনোয়ারা : না বুঝিয়া তোমাকে বাড়ির ওপর আসিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, মনে কিছু করিও না।

দুর্গা : না মা, সে-কথা আমি তখনই ভুলিয়া গিয়াছি। দেওয়ান সাহেবের শরীর কেমন?

আনোয়ারা : তাঁর কাশি একটু বাড়িয়াছে।

দুর্গা : আরামের উপায় আছে, কিন্তু বড় কঠিন।

আনোয়ারা : হাজার কঠিন হউক, তুমি আমাকে খুলিয়া বলো।

দুর্গা : আমার তেত্রিশ কোটি দেবতা; ক্ষয়কাশ, যক্ষ্মাকাশ, ওলাউঠা প্রভৃতি রোগকেও আমি দেবতা বলিয়া মানি। ইঁহারা যাহাকে ধরেন, তাহার নিস্তার নাই; তবে দেবতাগণকে তুষ্ট করিতে পারিলে তাঁহারা ছাড়িয়া দেন।

আনোয়ারা : দেবতারা কিসে তুষ্ট হন?

দুর্গা : আপনার স্বামীকে ক্ষয়কাশ দেবতা আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাকে ছাড়াইতে হইলে জীব-সঞ্চার-ব্রত সাধন করিতে হইবে, কিন্তু তাহা করা বড় কঠিন ব্যাপার।

আনোয়ারা : জীব-সঞ্চার-ব্রত কিরূপ?

দুর্গা : কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে মঙ্গলবার বা শনিবার দু প্রহর রাত্রিতে শ্মশান হইতে মড়া আনিয়া তাহার উপর বসিয়া যোগমন্ত্র পড়িতে হয়। তাহার গলায় কাপড় দিয়া ধন্বন্তরি দেবতাকে বলিতে হয়, হে মহাপ্রভু! আমার অমুক রোগীর শরীর হইতে অমুক রোগকে ছাড়িবার আদেশ করুন। তার ভোগের জন্য অন্য জীবন দিতেছি।

দুর্গার কথা শুনিয়া সভয়ে বালিকার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, মুখের বর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল। তাহার মনে এক বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল, স্বামী এবং ধর্ম, কাহাকে রক্ষা করি? এই বিরোধের ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। সে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নীরব হইয়া রহিল।

দুর্গা : মা, আপনি কি ভয় পাইলেন?

আনো : না, ভয় পাই না।

দুর্গা : তবে ব্রত করাইবেন?

আনো : তুমি বড়ই ভয়ানক কথা তুলিয়াছ। আমি স্বামীর জন্য প্রাণ দিতে তিলমাত্রও কুণ্ঠিত নহি, কিন্তু ধর্মভয়ে আমার প্রাণ কাঁপিতেছে। আমাদের কেতাবে এরূপ ব্রত করা শেরেক। যিনি প্রাণ দিয়াছেন তিনিই রক্ষা করিবেন—আমি স্বামীর প্রাণের বদলে আমার হৃদয়ের রক্ত দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমি কোনো শেরেকের কাজ করিতে পারিব না। আমাকে খোদার কাছে একদিন অবশ্যই জবাব দিতে হইবে।

দুর্গা চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। কিছু পরে বলিল, 'মা অন্য আর এক উপায় আছে।'

আনোয়ারা ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, 'আর কী উপায়?'

দুর্গা : সে উপায়ও বড় কঠিন।

আনোয়ারা : যতই কঠিন হোক না, তুমি খুলিয়া বলো।

দুর্গা : মৃতসঞ্জীবনী বলিয়া একরকম গাছ আছে। অমাবস্যার মাথায় দু প্রহর রাতে এলোচুলে পূর্বমুখো হইয়া সেই গাছের শিকড় এক নিশ্বাসে তুলিতে হয়। সেই শিকড় বাটিয়া খাইলে সকল রোগ আরাম হয়।

আনোয়ারা : এ আর কঠিন কী?

দুর্গা : না মা, যে সেই শিকড় তুলিবে তার সেই ব্যারাম হইবে। তাতে তার মরণ নিশ্চয়। প্রাণের বদলে প্রাণ, বুঝিলেন তো? এখন সেই শিকড় তুলিবে কে?

আনোয়ারা : লোকের অভাব হইবে না। তবে সে গাছ চেনা যায় কিরূপে?

দুর্গা বলিল : আগামী শনিবারে অমাবস্যা, সুতরাং আপনার স্বামীর প্রাণরক্ষার শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আমি সেই রাত্রিতে গাছ চিনাইয়া দিব।

আনোয়ারা : খোদা তোমার মঙ্গল করুন। আচ্ছা তুমি দু প্রহর রাতে আসিবে তাহা আমি কী করিয়া জানিব?

দুর্গা : তা-ও ঠিক, তবে বলুন, গাছ এখনই দেখাইয়া দিতেছি।

আনোয়ারা : মা, আমি তো পর্দার বাহিরে যাই না।

দুর্গা : তবে শনিবার রাতে আসাই স্থির রহিল। আমি আসিয়া আপনাকে ডাকিব।

আনোয়ারা : তা করিও না, কী জানি, ফুফুআম্মা যদি কিছু বলেন। তুমি কোনো সংকেতে ঠিক সময়ে আমাকে জানাইতে পারো না?

দুর্গা : (একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, আমি ঠিক দু প্রহর রাত্রির সময় আপনাদের উঠানে পর পর দুইটি ঢিল ফেলিব, তাহাতেই আপনি বুঝিবেন, আমি আসিয়াছি। সেই সময় আপনি আপনাদের বৈঠকখানার বাগানের সামনে আসিবেন।

আনোয়ারা আশ্বস্ত হইয়া বৈষ্ণবীকে একটু বসিতে বলিয়া ঘর হইতে বিশটি টাকা আনিয়া দুর্গার হাতে দিল এবং কহিল : আজ তুমি আমার মা'র কাজ করিলে। তোমার জল খাইবার জন্য এই সামান্য কিছু দিলাম, কিছু মনে করিও না।

দুর্গা জিভ কাটিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল : মা, দেখিবেন এ-কথা অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।

১৪ ❑ রাত্রি বারোটা বাজিল

শনিবারের আর দুইদিন মাত্র বাকি। চিন্তায় বালিকার কোমল হৃদয় আলোড়িত ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। সে একবার ভাবিল, সমস্ত কথা স্বামীর নিকট খুলিয়া বলি; আবার ভাবিল, তিনি যদি বিশ্বাস না-করেন, অথবা প্রাণের বদলে প্রাণ রক্ষা করা ঘৃণা বোধ করেন, তবে আর তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিলাম না। অতএব আগে তাঁহাকে এই কথা জানাইব না। এইরূপ বিতর্ক করিয়া আনোয়ারা স্বামীকে কিছু জানাইল না।

রাত্রিতে আনোয়ারা ঘরে আসিল। এশার নামাজ-অন্তে কায়মনোবাক্যে মোনাজাত করিল।

বালিকা ধীরে ধীরে উঠিয়া দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িল। তারপর চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল :

> যে বৈষ্ণবী আমাদের বাড়িতে ভিক্ষা করিতে আইসে, সে আপনার পীড়ার অবস্থা শুনিয়া বলিল, মৃতসঞ্জীবনী লতা ভিন্ন কোনো ঔষধে ঐ ব্যাধি আরোগ্য হইবে না।

মৃতসঞ্জীবনী লতার গুণ সম্বন্ধে পাছে আপনি অবিশ্বাস করেন বা আমাকে লতা তুলিতে নিষেধ করেন, এই ভয়ে আপনাকে আগে জানাইলাম না, অপরাধ ও ধৃষ্টতা নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। আমি শনিবার নিশীথকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। আপনাকে রোগমুক্ত করিতে পারিব ভাবিয়া, দাসীর হৃদয়ে যে উল্লাস-লহরি খেলিতেছে, তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাইতেছি না। অতএব আমার অভাবে আপনি দুঃখিত হইবেন না।

ইতি—

আনোয়ারা

বালিকা পত্র লিখিয়া নিদ্রিত স্বামীর উপাধানের নিচে তাহা রাখিয়া দিল।

পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে শনিবারের দিনের আলো নিভিয়া গেল।

সতী মৃত্যুপথের যাত্রীরূপে প্রস্তুত হইতে লাগিল। সন্ধার পূর্বেই সে স্বামীকে আহার করাইল। যথাসময়ে শোমাদানে মোমের বাতি জ্বালাইল। মাগরেবের নামাজ শেষ করিয়া রন্ধন-আঙিনায় প্রবেশ করিল। তাহার হাবভাব স্ফূর্তি দেখিয়া ফুফুআম্মা স্তম্ভিত হইলেন। বিষাদের প্রতিমূর্তি বউ বিবিকে আজ উৎফুল্ল দেখিয়া সুশীলা দাসীও সুখী হইল।

আহারান্তে সকলেই ঘরে গেল। আনোয়ারা ঘরে আসিয়া একাগ্রচিত্তে এশার নামাজ পড়িল। নামাজ-অন্তে কায়মনোবাক্যে সংকল্প সাফল্যহেতু শেষ মোনাজাত করিল। আরাধনাশেষে হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি দিয়া পতির চরণে হাত বুলাইতে লাগিল। সতীর হস্তস্পর্শে নুরল এসলাম ক্রমে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। আনোয়ারা ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, রাত্রি এগারোটা। আর এক ঘণ্টা পরে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইবে। তখন তাহাকে সংকল্প সাধনের জন্য বহির্বাটিতে উপস্থিত হইতে হইবে। অসূর্যম্পশ্যা বালিকাবধূর গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন গভীর নিশীথে একাকিনী বহির্বাটিতে গমন! ইহাও কি সম্ভব?

রাত্রি বারোটা। আনোয়ারা উৎকণ্ঠিতচিত্তে ঘর বাহির যাতায়াত আরম্ভ করিল। নীরব নিশীথে পতির রোগমুক্তি কামনায় সতী গৃহ হইতে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠিক এমন সময় দুইটি ঢিল পরপর আসিয়া প্রাঙ্গণে পতিত হইল। সতী সংকেত বুঝিয়া তাড়াতাড়ি বহির্বাটির উদ্যানপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু হায়! পরক্ষণে গালপাট্টা-বান্ধা একজন যুবক পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল। সতীর দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া গেল।

১৫ ❑ আনোয়ারা কোথায় গিয়াছিল?

এদিকে নুরল এসলাম কাশিতে কাশিতে কিছুক্ষণ পরে জাগিলেন। ঘরে বাতি জ্বলিতেছিল। অন্যান্য দিন কাশিবা মাত্র আনোয়ারা উঠিয়া তাঁহার সম্মুখে পিকদান ধরে, আজ তিনি কাশি ফেলিবার পিকদান নিকটে পাইলেন না। উঠিয়া বসিলেন। পীড়ার আরম্ভ হইতে আনোয়ারা স্বামীর শয়নখাটের সংলগ্ন চকিতে পৃথক শয্যায় শয়ন করে। নুরল দেখিলেন সে বিছানা শূন্য। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন একটা বাজিয়া গিয়াছে। মনে করিলেন, বাহিরে গিয়াছে, এখনই আসিবে। কিন্তু হায়! বহুক্ষণ অতীত হইয়া গেল—তথাপি আনোয়ারা ঘরে ফিরিল না। নুরল এসলাম তখন 'ফুফুআম্মা' বলিয়া দুই-তিন বার ডাকিলেন। তিনি শশব্যস্তে দরজা খুলিয়া ছেলের ঘরের বারান্দায় আসিলেন। চাকরানী ফুফু-আম্মার ঘরে থাকিত, সে-ও তাঁহার পাছে পাছে উঠিয়া আসিল।

ফুফু : বাবা ডাকো কেন?

নুরুল : আপনাদের বউ কোথায়?

ফুফু : ওমা, সে কী কথা। বউ তো আমার কাছে যায় নাই। খুশি, তুমি পাকের আঙ্গিনায় দেখিয়া আইস।

চাকরানী খুশি, সে আলো জ্বালিয়া রান্নার আঙিনার দিকে গেল। ফুফু ভাণ্ডারঘর, তাঁর শয়নঘর দেখিতে গেলেন। নুরুল এসলামের মাথা ঘুরিতে লাগিল। ফুফুআম্মা ও খুশি হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলে নুরুল এসলাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কী হইল? পাওয়া গেল না? ফুফু ও খুশি নীরব। নুরুল এসলাম 'হায় হায়' করিতে করিতে শয্যায় পড়িয়া গেলেন। ফুফুআম্মা তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া দেখেন, ছেলের মূর্ছা হইয়াছে। তিনি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

এমন সময় 'হুরে হু হামবোল হুম' রবে দুইখানি পালকি বাড়ির মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। উকিলসাহেব পালকির ভিতর হইতে নামিয়া বন্ধুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। ফুফুআম্মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন : বাবা আমার সর্বনাশের উপর সর্বনাশ! বউমা আমার ঘরে নাই। ছেলে তাহা শুনিয়া অজ্ঞান হইয়াছে।

উকিলসাহেব কহিলেন, 'আপনার বউমা উঠানে পালকির ভিতরে আছেন, তাঁহাকে ঘরে তুলিয়া লউন। তাঁহার অবস্থাও শোচনীয়। একটু পাতলা গরম দুধ এসময় তাঁহাকে খাওয়াইতে পারিলে ভালো হয়। আমি দোস্ত সাহেবের মূর্ছা ভাঙার চেষ্টা করি।'

ফুফুআম্মা কতকটা বিস্মিত, কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বউয়ের কাছে গেলেন।

এদিকে উকিলসাহেব দেখিলেন, তাঁহার দোস্তের দাঁত লাগিয়াছে। ব্যারামের শরীর, রাত্রিতে মাথায় পানি না-দিয়া তিনি পকেট হইতে একটা ঔষধ বাহির করিয়া তাঁহার নাকের নিকট ধরিলেন। পাঁচ ছয় মিনিট পরে জোরে নিশ্বাস চলিল, তারপর নুরুল এসলাম চক্ষু মেলিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইতে লাগিলেন। উকিলসাহেব বলিলেন, 'আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?'

নুরুল : 'দোস্ত, তুমি আসিয়াছ! আমার প্রাণের আনোয়ারা'—আবার অজ্ঞান হইলেন। উকিলসাহেব চিন্তিত হইলেন। শেষে ইতস্তত করিয়া সাহসের সহিত মাথায় ঠাণ্ডা পানির ধারা দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে নুরুল আবার চক্ষু মেলিলেন, আবার 'আমার আনোয়ারা কোথায়?' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। উকিলসাহেব বলিলেন, 'তুমি আশ্বস্ত হও, তিনি ফুফুআম্মার ঘরে আছেন।'

এদিকে ফুফুআম্মা ও দাসীর যত্নচেষ্টায় আনোয়ারা অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিল। নুরুল ঘরে প্রবেশ করিলে সে মাথায় কাপড় টানিয়া দিল। তখন অন্যান্য সকলে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নুরুল এসলাম শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার ঘোমটা খুলিয়া দিলেন। মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার গোলাপগণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইতেছে।

পলকে যেন প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়া গেল। স্বামীর হস্তস্পর্শে তাহার শিরায় শিরায় তড়িৎ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। সে অভাবনীয় শক্তিলাভে শয্যায় উঠিয়া বসিল। কাহারও মুখে কোনো কথা নাই। যেন শতাব্দীর বিচ্ছেদের পর পরস্পরের সন্দর্শন। কিন্তু ভাবোচ্ছ্বাসে উভয়ে নীরব। নুরুল এসলাম এই সময় মৌনভাব ভঙ্গ করিয়া আনোয়ারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমাকে ফেলিয়া কোথায় গিয়াছিলে?'

আনো : বলিব না।

নুরুল : আমাকে না-বলিবার তোমার কিছু আছে নাকি?

আনোয়ারা লজ্জিত হইল এবং উত্তর চাপা দেওয়ার জন্য কহিল, 'আপনার শরীর কেমন আছে?'

নুরুল : তোমাকে পাইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছি। আমার যেন কোনো পীড়া হয় নাই বলিয়া বোধ হইতেছে।

আনোয়ারা কহিল : আমি যদি সতী হই, কায়মনোবাক্যে যদি খোদাতালার নিকট আপনার আরোগ্যের জন্য মোনাজাত করিয়া থাকি, তবে অদ্য হইতে আপনি নীরোগ হইবেন।

নুরুল : তুমি যে কোন সাধনাবলে আমাকে যমদ্বার হইতে ফিরাইয়াছ বুঝিতেছি না। সত্যই এখন আমার কোনো পীড়া নাই। আশ্চর্যভাবে শরীর বলবান হইয়াছে।

আনোয়ারা স্মিতমুখে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, কোনো উত্তর করিল না।

নুরুল : চলো, ঘরে যাই।

আনো : আমার শরীর দুর্বল, উঠিতে পারিব না। এখানে বসিয়াই ফজরের নামাজ পড়িব।

নুরুল এসলাম আর কিছু বলিলেন না। আস্তে আস্তে বাহিরে আসিলেন। বসন্তের প্রাতঃসমীরণস্পর্শে তিনি যারপরনাই সুখবোধ করিতে লাগিলেন। যষ্ঠিহস্তে কিয়ৎক্ষণ প্রাঙ্গণে পদচারণ করিয়া বহির্বাটির উদ্যানসম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উকিলসাহেব এই সময় ঘুম হইতে জাগিলেন। তিনি নুরুল এসলামকে বাগানপার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া কহিলেন, 'কাতর শরীর লইয়া এত প্রত্যূষে উঠিয়াছ কেন?'

নুরুল : আজ আমার শরীর খুব সুস্থবোধ হইতেছে, আমি যেন নবজীবন লাভ করিয়াছি।

এই বলিয়া তিনি বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় উঠিয়া ইজিচেয়ারে উপবেশন করিলেন। উকিলসাহেব এই বৈঠকখানা ঘরে শয়ন করিয়াছিলেন।

উকিল : সই কেমন আছেন?

নুরুল : অনেকটা ভালো; কিন্তু তার কথাবার্তায় আমি বিষম ধাঁধায় পড়িয়া গিয়াছি।

উকিল : সে কেমন?

নুরুল : রাত্রিতে তার ঘর হইতে উঠিয়া যাওয়া, চেষ্টা করিয়া না-পাওয়া, পালকিতে চড়া, ফুফুআম্মার ঘরে শোওয়া, তার সুস্থ শরীর দুর্বল হওয়া—এই সকল কারণ জিজ্ঞাসা করায়, 'বলিব না' বলিয়া উত্তর দেওয়ায় মনে অত্যন্ত খটকা লাগিয়াছে।

উকিল : নামাজ পড়ি।

উভয়ে একত্রে ফজরের নামাজ পড়িলেন। উকিলসাহেব বেহারাদিগকে পালকি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া পোশাক পরিতে লাগিলেন।

নুরুল : কোথায় যাইবে?

উকিল : একটু বেলগাঁও হইতে বেড়াইয়া আসি। তারপর তোমার মনের খটকা দূর করিব।

রাত্রির ঘটনা সরলা ফুফুআম্মা কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। আনোয়ারা কাহার যেন দৈত্যবৎ মূর্তি দেখিয়াছিল। পলকমাত্রকাল স্পর্শকাঠিন্য অনুভব করিয়াছিল, আর কিছু জানিত না, কিছুই বুঝিতেও পারে নাই, তাহার সেই মুহূর্তমাত্রের ক্ষীণস্মৃতি পতির আরোগ্যজনিত আনন্দে ডুবিয়া গিয়াছিল।

আনোয়ারার কী হইয়াছিল? পূর্বে বলা হইয়াছে বেলগাঁও হইতে জেলা পর্যন্ত নৈর্ঋত কোণে যে বাঁধাসড়ক আছে তাহা রতনদিয়া বাজারের দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে। রতনদিয়া হইতে সেই পথে এক মাইল গেলে প্রায় অর্ধমাইল ব্যাপিয়া সড়কের উভয়দিকে নিবিড় বেতস বন নিম্ন সমতলে অবস্থিত। দুইখানি গাড়ি বা পালকি পরস্পর ঘেঁষাঘেষিভাবে পাশাপাশি যাতায়াত করিতে পারে, সড়কের প্রস্থ এই পরিমাণ। পাপিষ্ঠেরা আনোয়ারাকে অজ্ঞানাবস্থায় পালকিতে তুলিয়া এই সংকীর্ণ বেতস বন-পথের মধ্যস্থলে আসিলে, অদূরে সম্মুখে আলো দেখিতে পায়। গণেশ ও কলিম পালকির সম্মুখে ছিল। গণেশ কহিল : ভাই আব্বাস, প্রমাদ দেখিতেছি।

আব্বাস : কেনরে কেন?

গণেশ : সম্মুখে আলো দেখিতেছি।

আব্বাস লম্ফ দিয়া গণেশের স্থান অধিকার করিল, গণেশ পশ্চাতে হটিয়া গেল।

আব্বাস : পালকি বলিয়া বোধ হইতেছে।

কলিম : পালকি তো বটেই, আবার একখানা নয়, দুইখানা।

আব্বাসের মুখ শুকাইল। তথাপি সে সাহসে ভর করিয়া কহিল, আমাদের পালকিতে বাতি আছে। উহারা আমাদিগকে কিছু বলিবে না। পাপিষ্ঠরা আনোয়ারাকে পালকিতে তুলিয়া পালকির সম্মুখে অসীম সাহসে আলো জ্বালাইয়া লইয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে সম্মুখের পালকি নিকটে আসিল। পালকির আগে-পাছে কনস্টেবল দুইজন, চৌকিদার দশ-বারোজন। অগ্রগামী কনস্টেবল আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমহারা পালকি কাঁহাছে আতা হ্যায়?

আব্বাস : স্টিমার ঘাটছে।

কনস্টেবল : কাঁহা যাতা হ্যায়?

আব্বাস : জেলাকো উপর।

কনস্টেবল : পালকিকা আন্দার কোন হ্যায়?

আব্বাস : উকিলসাহেবকা বিবি হ্যায়।

কনস্টেবল : কোন উকিলসাহেবকা?

আব্বাস উকিলসাহেবের নাম জানে না। দুই-একবার মোকদ্দমায় পড়িয়া পিতার সহিত উকিলসাহেবের বাসায় গিয়াছিল মাত্র। উকিলসাহেব খুব জরবদস্ত নামজাদা এবং মুসলমান, সে এইমাত্র জানিত। তাই কনস্টেবলের কথার উত্তরে বলিল, মুসলমান উকিলকা—অসম্পূর্ণ উত্তর শুনিয়া কনস্টেবলেরা হাসিয়া উঠিল। গণেশ ভাবিল, আব্বাস ঠকিয়া গিয়াছে, মুসলমান উকিলের নামে বিপদ কাটিবে না। এইরূপ ভাবিয়া সে কহিল : 'সিপাই সাহেব, ও বোকার ওস্তাদ থা, চুড়নকে ঢেঁকি বলিয়া ফেলতা হ্যায়। পালকির ভিতর ডেপুটিবাবুর মেমসাহেব বিবি রতা।' কনস্টেবলেরা অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। দুই-তিন মিনিটে এই সকল কথার রহস্য হইল। ডেপুটিবাবু নিজ পালকি থামাইয়া অনুচরদিগকে কহিলেন, 'আভি ওসকা পালকি পাকড়ালেও।' পশ্চাদ্বর্তী পালকি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন : 'উকিলসাহেব, আপনার সঙ্গের লোক দিয়া সম্মুখের পালকি ঠেকাইয়া দেন।' কথানুসারে কার্য হইল। ডেপুটিবাবু হাঁটিয়া উকিলসাহেবের পালকির নিকট উপস্থিত হইলেন। আব্বাস আলী ও কলিম প্রভৃতি তখন অনন্যোপায়ে লাঠি অবলম্বনে বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল

না। অবশিষ্ট চৌকিদার ও কনস্টেবলের অবিশ্রান্ত যষ্টিপ্রহারে তাহারা মাটিতে পড়িয়া গেল। গণেশ পলাইতে চেষ্টা করিয়া সড়কের নিচে গড়াইতে গড়াইতে বেতস বনে আটকাইয়া পড়িল।

ডেপুটিবাবু উকিলসাহেবকে কহিলেন : দেখুন পালকির ভিতরে কে আছে?

একজন চৌকিদার আলো ধরিল, উকিলসাহেব স্বহস্তে পালকির দরজা খুলিয়া দেখিলেন একজন অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী অজ্ঞানাবস্থায় পালকিতে পড়িয়া আছে। তাঁহার মুখে কাপড় গোঁজা। উকিলসাহেব মুখের কাপড় টানিয়া বাহির করিলেন। যুবতী গোঙাইয়া উঠিল এবং তাঁহার মুখ দিয়া এক ঝলক রক্ত নির্গত হইয়া পড়িল। উকিলসাহেব বাতির আলো তাঁহার মুখের কাছে ধরিয়া ভালো করিয়া দেখিলেন। দৃষ্টিমাত্র তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, 'জলদি পানি।'

ডেপুটিবাবু গণেশকে একজন চৌকিদারের জিম্মায় দিয়া উকিলসাহেবের নিকট আসিলেন। এদিকে উকিলসাহেব যুবতীর মাথায় পানির ধারা দিতে দিতে সে ক্রমে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল, ক্রমে চোখ মেলিয়া চাহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অস্ফুটস্বরে কহিল : 'আমি কোথায়?' উকিলসাহেব কহিলেন : 'আপনি ভালো স্থানে আছেন।' যুবতী উকিলসাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় নয়ন মুদ্রিত করিল।

ডেপুটিবাবু কহিলেন : 'খুবই অবসন্ন হইয়াছেন, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। যাওয়ার বন্দোবস্ত করুন।' উকিলসাহেবের পালকিতে আটজন বেহারা ছিল। তাহাদের চারজন যুবতীকে স্কন্ধে লইল। ডেপুটিবাবু ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন রাত্রি দেড়টা।

ডেপুটিবাবু ডাকবাংলায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। উকিলসাহেবের পালকি তথায় উপস্থিত হইলে ডেপুটিবাবু তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণপূর্বক ঘরে লইয়া গেলেন। এই সময় ঘরের ভিতর এক রমণী ও এক নবীন যুবক উপস্থিত ছিল। উকিলসাহেব আসন গ্রহণ করিলে ডেপুটিবাবু আগ্রহসহকারে ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার বন্ধুপত্নী কেমন আছেন?

উকিল : অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন।

ডেপুটি : তাঁহার পতিপরায়ণতায় শত ধন্যবাদ। এই–যে স্ত্রীলোকটি দেখিতেছেন, এইটি বদমাইশ দলের গোড়া। ইহার নাম দুর্গা। যুবকের নাম গণেশ। ইহারা নানাবিধ প্রলোভন ও কৌশলে বশীভূত করিয়া সতীহরণের চক্রান্ত করিয়াছিল। ইহাদের মুখে যাহা শুনিলাম, তাহা যদি হয়, তবে আপনার বন্ধুপত্নীর মতো সতীসাধ্বী জগতে বিরল বলিতে হইবে। পতির প্রাণরক্ষায় সরল বিশ্বাসে, সরল প্রাণে এইরূপভাবে প্রাণদানে উদ্যতা কোনো রমণীর কথা এ–পর্যন্ত কোথাও শুনি নাই, এমনকি কোনো পুরাতন ইতিহাসে আছে কি না তাহাও জানি না।

এই বলিয়া তিনি উকিলসাহেবের নিকট দুর্গার কথিত জীবন–সঞ্চার–ব্রতের কথা ও সঞ্জীবনী লতার কথা সবিস্তারে বলিলেন।

ডেপুটি : ইহাদের কঠিনভাবে শাস্তি দিতে হইবে।

উকিল : আমি আপনার নিকট সর্বান্তঃকরণে তাহাই প্রার্থনা করিতেছি।

ডেপুটি : ইহাদিগকে এই বেলাতেই জেলায় চালান দিব। মোকদ্দমা গভর্নমেন্ট বাদী হইয়া চলিবে। তার পর হাসিয়া কহিলেন, 'আপনাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইবে।'

উকিল : আপনি তো মূর্তিমান গভর্নমেন্ট। ঐ পবিত্রাসনে আপনাকেই আগে পা দিতে হইবে।

ডেপটি : (স্মিতমুখে) তাহা তো বুঝিতেছি। এই গণেশ বেটাকে সাক্ষীশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে হইবে।

উকিল : আমিও মনে করিয়াছি। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি, বদমাইশদিগের প্রতি আপনার সন্দেহ হইয়াছিল কিরূপে?

ডেপুটি : সে এক হাসির কাণ্ডকারখানা; মোটকথা, এই গণেশ ও আব্বাসের কথায় অনৈক্য হওয়াতে আমার সন্দেহ হয়।

'এখন আসি', বলিয়া উকিলসাহেব বিদায় গ্রহণ করিলেন।

১৭ ❑ সেই পত্রটি

আব্বাস আলী নামজাদা ধনীর একমাত্র আদরের পুত্র। দুষ্কার্য করিয়া এ-পর্যন্ত কেবল অর্থবলেই রক্ষা পাইয়াছে, কখনও ধরা পড়ে নাই। সে অদ্য থানার ঘরে বন্দী। তাহার হাতে আজ হাতকড়া। তাহার সহিত খাদেম আলী, করিম, দুর্গা তদবস্থায় আবদ্ধা। —এ কথা বন্দরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে। আব্বাস আলীর পিতা রহমতুল্লা মিঞা প্রাতঃকালে আসিয়া দারোগা বাবুকে একশত টাকার নোট দিয়া সেলাম করিয়াছেন। মিঞাকে কহিলেন : বড়ই কঠিন ব্যাপার, স্বয়ং জেলার বড় ডেপুটিবাবু গ্রেপ্তারকারী। তাঁহার মতো কড়া হাকিম এদেশে আর নাই।

রহমতুল্লা : যত টাকা লাগে দিতেছি, আপনি আমার ছেলেকে রক্ষা করুন।

দারোগা : কোনো উপায় দেখিতেছি না।

রহমতুল্লা : আপনি হাকিমকে যত টাকা লাগে দিয়া উপায় করুন।

দারোগা : বাপরে! তবে এখনই চাকরিটা খোয়াইয়া জেলে যাইতে হইবে।

রহমতুল্লা মিঞা হতাশ হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

দারোগা : আপনি নিজে যাইয়া ডেপুটিবাবুর পা ধরিয়া কবুল করাইতে পারেন কি না চেষ্টা করুন। তবে দুই-চার হাজার টাকার কথা মুখে আনিবেন না। অনেক ওপরে উঠিতে হইবে।

রহমতুল্লা মিঞা তখন অসীম সাহসে ডাকবাংলায় উপস্থিত হইয়া ডেপুটিবাবুর নিকট নিজ পরিচয় দিলেন এবং পুত্রের রক্ষার জন্য তাঁহার পা ধরিয়া একেবারে দশহাজার টাকা স্বীকার করিলেন। এই সময় তথায় আর কেহ ছিল না। এককালে দশহাজার টাকা ঘুষের কথায় হাকিমপ্রবরের মনে কিঞ্চিৎ ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তথাপি তিনি মুখে ক্রোধ জানাইয়া কহিলেন, 'তোমার এতদূর সাহস? আমার কাছে ঘুষের প্রস্তাব! তোমাকে জেলে দিব।'

আব্বাস আলীর পিতা এগারো হাজার স্বীকার করিলেন।

এবার ডেপুটি সদয়ভাবে কহিলেন, 'এ তো আচ্ছা লোক দেখিতেছি।'

আব্বাস আলীর পিতা আরও এক হাজার স্বীকার করিলেন।

ডেপুটি—পা ছাড়ুন। উঠিয়া বসুন।

তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, লোকটাকে রক্ষা করা উচিত কি না? পরে রহমতুল্লা মিঞাকে কহিলেন : 'যেভাবে চুরি, ইহাতে আপনার পুত্র চৌদ্দ বৎসর জেলের কাবেল।' তখন আরও হাজার টাকা স্বীকার করিয়া আব্বাসের পিতা পুনরায় ডেপুটিবাবুর পা জড়াইয়া ধরিলেন। তখন ডেপুটিবাবু তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বসাইলেন। তাহার পর বড়ে দিয়া দাবা মারিয়া জিতিবার মানসে এক নতুন চাল চালিলেন। কহিলেন, আপনি জেলার বড় উকিল মীর আমজাদ হোসেনকে চিনেন?

রহমতুল্লা : চিনি, তাঁর দ্বারা অনেকবার মোকদ্দমাও করাইয়াছি।

ডেপুটি : তিনি এতক্ষণে রতনদিয়ায় তাঁহার বন্ধু নুরল এসলাম সাহেবের বাড়িতে আছেন। তিনি এই মোকদ্দমার সাক্ষী, আপনি তাঁহাকে বশ করিতে পারিলে আপনার ছেলের সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

ডেপুটিবাবুর বিশ্বাস একযোগে বেশি টাকা উৎকোচ পাইলে উকিল তাঁহার দোস্তকে রাজি করাইয়া নিশ্চয় মোকদ্দমাও ছাড়িয়া দিবেন। উকিলসাহেব রতনদিয়ায় আসিয়া নাশতা করিয়া সবেমাত্র বাহিরবাড়িতে আসিয়াছেন, এমন সময় রহমতুল্লা মিঞা তথায় উপস্থিত হইলেন। উকিলসাহেব তাঁহাকে পূর্ব হইতে জানেন। এজন্য কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতে বলিলেন। মিঞা সাহেব আদর পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন। একটু পরে তিনি সসম্মানে উকিলসাহেবকে নির্জন উদ্যান অন্তরালে লইয়া গিয়া ছেলের চুরির কথা বলিয়া ক্রমে পাঁচ হাজার হইতে পনেরো হাজার পর্যন্ত স্বীকার করিলেন। উকিলসাহেব, লোকটা কত টাকা দিতে পারে শুধু একটুকু জানিবার ইচ্ছায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। যখন কুড়ি হাজার টাকা স্বীকার করিয়া মিঞা সাহেব তাঁহার পায়ের ওপর পড়িয়া গেলেন, তখন তিনি সজোরে পা ছাড়াইয়া বৈঠকখানার দিকে চলিয়া আসিলেন। উকিলসাহেব অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিবার কিছুকাল পরে নুরল এসলাম যষ্টিহস্তে বাহিরবাড়িতে আসিয়া ঐ ঘটনা দেখিয়াছিলেন। উকিলসাহেব বৈঠকখানায় আসিয়া উপবেশন করিলে নুরল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপারখানা কী?'

উকিলসাহেব রাত্রির সমস্ত ঘটনা এবং ডেপুটিবাবুর মুখের জীব-সঞ্চার-ব্রতের কথা ও সঞ্জীবনী লতা তোলার কথা যাহা শুনিয়াছিলেন সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। নুরল এসলাম দম ফেলিয়া আশ্বস্ত হইলেন।

এদিকে আব্বাসের পিতা পুনরায় ডেপুটিবাবুর নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন কিন্তু কোনো ফল হইল না।

আনোয়ারার ঐকান্তিক সেবা-শুশ্রূষায় নুরল এসলাম অল্পদিনেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

একদিন আনোয়ারা তাহার শয়নঘরের যাবতীয় শয্যা ও বস্ত্রাদি দাসীকে রৌদ্রে দিতে আদেশ করিল। দাসী একে একে বালিশ, গদি, তোশক, বস্ত্র প্রভৃতি রৌদ্রে দিল। আনোয়ারা সঞ্জীবনী লতা তুলিবার পূর্বরাত্রিতে স্বামীকে যে চিরবিদায়লিপি লিখিয়া তাঁহার উপাধানদেশে রাখিয়া দিয়াছিল, তাহা তাহার স্মরণ ছিল না। নুরল ইসলামেরও ইতঃপূর্বে তাহা হস্তগত হয় নাই। দাসী বালিশের নিচের সেই চিঠি প্রয়োজনীয় মনে করিয়া মনিবের একটি আচকানের পকেটে রাখিয়া দিল।

১৮ ❑ পুণ্যের জয়

আব্বাস আলী প্রভৃতি বদমাইশেরা জেলায় আসিয়া হাজতে পচিতে লাগিল। বহু চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করিয়াও আব্বাস আলীর পিতা ছেলের হাজতমুক্তির জন্য জামিন মঞ্জুর করিতে পারিলেন না। ম্যাজিস্ট্রেট বিচারান্তে মোকদ্দমা দায়রায় দিলেন। আব্বাস আলীর পিতা ব্যারিস্টার নিযুক্ত করিলেন। খাদেম আলীর পিতা বেলগাঁওয়ের দোকানপাট ও গোপীনপুরে তালুক বিক্রয় করিয়া আব্বাস আলীর পিতার সহিত এজমালিতে মোকদ্দমার খরচ চালাইতে লাগিলেন। কলিমের পিতা ও গণেশের অভিভাবক ব্যয় বাহুল্য করা নিষ্ফল মনে করিলেন। জজ সাহেবের আদেশানুসারে জনৈক উকিল আনোয়ারার জবানবন্দি লইতে রতনদিয়ায় আসিলেন। আসামির ব্যারিস্টারও সঙ্গে আসিলেন। গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে একজন

উকিল নিযুক্ত হইলেন। নুরল এসলাম স্ত্রীকে কহিলেন, তোমার জবানবন্দি করিতে জেলা হইতে উকিল ব্যারিস্টার আসিয়াছেন।

দুর্গা বৈষ্ণবীর শয়তানী লীলা ও ষড়যন্ত্রের কথা বর্ণনা করিয়া নুরল কহিলেন, 'দোস্ত সাহেব পাপিষ্ঠদিগের শাস্তির জন্য এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন। সেই মোকদ্দমায় তোমার জবানবন্দি দরকার।'

আনোয়ারা বৈষ্ণবীর বজ্জাতির কথা মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিল। লজ্জায়, ঘৃণায় সে মরিয়া যাইতে লাগিল। তথাপি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে কহিল, 'উহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে হয় না?'

নুরল : আমি তোমার মনের উন্নত অবস্থা বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু ছাড়িয়া দিবার অধিকারী আমরা নহি, স্বয়ং গভর্নমেন্ট বাদী, তাছাড়া এক্ষেত্রে পাপীকে শাস্তি প্রদান করিলেই জগতে মঙ্গল বিধান করা হইবে।

আনোয়ারা স্বামীর আদেশে পর্দার অন্তরালে থাকিয়া অনুচ্চভাবে উকিল ব্যারিস্টারের কথার উত্তর দিতে আরম্ভ করিল।

গভর্নমেন্টের উকিল দুর্গা বৈষ্ণবীর ভিক্ষা করা হইতে আরম্ভ করিয়া বদমাইশদের গ্রেফতার পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনা তন্নতন্ন করিয়া একে একে সসম্মানে আনোয়ারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আনোয়ারা যাহা স্মরণ ছিল সমস্ত কথার উত্তর দিল। আনোয়ারা যেরূপ সত্যতা ও তেজস্বিতার সহিত উকিলের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর করিল, তাহাতে আসামির ব্যারিস্টার আসামিকে রক্ষা করা সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়িলেন।

গণেশ সাক্ষীরূপে সরলমনে সব ঘটনা খুলিয়া বলিল। আব্বাস, কলিম প্রভৃতি পাষণ্ডেরা দুর্গাবৈষ্ণবীর সাহায্যে যেরূপ কৌশলে কুলবধূকে ঘরের বাহির করে—অতি বিশ্বাস্য প্রমাণ প্রয়োগে গণেশ সে-সকল কথা বলিয়া গেল।

অতঃপর উকিল, ব্যারিস্টারের বক্তৃতা ও আইনঘটিত যুক্তিতর্কের কথা জজ সাহেব শুনিলেন। তদনন্তর জুরিদিগকে মোকদ্দমার অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। জুরিগণ একবাক্যে আসামিদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন।

পরিশেষে জজ সাহেব রায় লিখিয়া হুকুম দিলেন, আব্বাস আলী ও দুর্গাবৈষ্ণবীর প্রতি কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাত বৎসর, কলিম ও খাদেম আলীর প্রতি চারি বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইল। বেহারাগণেরও এক বৎসরের শাস্তি হইল। গণেশ প্রকৃত ঘটনার সাক্ষী দেওয়ায় বেকসুর খালাস পাইল। সদাশয় জজ রায়ে আনোয়ারার সরলতা ও পতিপরায়ণতার কথা উল্লেখ করিতে ত্রুটি করিলেন না।

আব্বাস আলী ও খাদেমের পিতা হায় হায় করিতে করিতে বাড়ি ফিরিলেন। সালেহার মা মাথা কুটিয়া আনোয়ারাকে অভিসম্পাৎ করিতে লাগিলেন। একদিন মাতার এই অবৈধ গালাগালি শুনিয়া সালেহা তাহার প্রতিবাদ করিল। মা ক্ষিপ্তার ন্যায় হইয়া সালেহাকে স্বহস্তে প্রহার করিলেন। কন্যা দুঃখে অভিমানে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া আনোয়ারার নিকট উপস্থিত হইল। আনোয়ারা তাহাকে সস্নেহে সাদরে গ্রহণ করিল।

এদিকে খাদেম আলীর পিতা পুত্রের দোষে সর্বস্ব হারাইয়া সপরিবারে ভগ্নীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

স্ত্রীর সেবাসাধনায় নুরল এসলাম পূর্ণস্বাস্থ্য লাভ করিয়া কোম্পানির কার্যে পুনঃপ্রবৃত্ত হইলেন।

পরিণাম পর্ব

তৃতীয় খণ্ড

১ ❑ ষড়যন্ত্রের শুরু

নুরুল এসলামের পরবর্তী জীবনের ঘটনা বর্ণনা করিবার পূর্বে, বেলগাঁও বন্দরের একটি চিত্র এ-স্থলে দেওয়ার আবশ্যক হইয়াছে।

স্রোতোবাহিনী সরিতের পশ্চিমতটে বেলগাঁও বন্দর অবস্থিত। বন্দরের দক্ষিণ উপকণ্ঠে কোম্পানির পাটের কারখানা ও অফিস ঘর। নাতিবৃহৎ অফিসগৃহ করগেট টিনে নির্মিত, দুই প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, সদর দরজা দক্ষিণমুখে। পশ্চিমের প্রকোষ্ঠে বড়বাবু নুরুল এসলাম, পূর্বপ্রকোষ্ঠে ছোটবাবু রতীশচন্দ্র সরকার কার্য করেন। প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুকে কোম্পানির মূলধন থাকে, তাহা পশ্চিম প্রকোষ্ঠে বড়বাবুর জিম্মায়। গ্রীষ্মকালে তটিনীর সৈকতসীমা পূর্বদিকে বহুদূর বিস্তৃত হয়, এইজন্য এইসময় বন্দরে পানির বড়ই কষ্ট হয়। সদাশয় জুট ম্যানেজার সর্বসাধারণের এই পানির কষ্ট নিবারণের জন্য কোম্পানির অর্থে, অফিসঘরের পশ্চিমাংশে একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছেন। পুষ্করিণীর পূর্বে ও উত্তরে দুইটি শানবাঁধা ঘাট। পূর্বের ঘাট দিয়া অফিসের লোক ও উত্তরের ঘাট দিয়া সাধারণ লোক পানির জন্যে যাতায়াত করে। পশ্চিমপাড় নানাবিধ আগাছা ও লতাগুল্মে পূর্ণ, দক্ষিণদিকে কোম্পানির ফলবান বৃক্ষের বাগান। অফিসঘরের উত্তরদিকে অনতিদূরে বড়বাবুর বাসা। বাসার উত্তরপ্রান্তে জুম্মা মসজিদ। মসজিদের বায়ুকোণে বাজার। সোম ও শুক্রবারে বন্দরে হাট বসে। বন্দরের পশ্চিমাংশে থানার ঘর।

রতীশবাবুর বাসা বন্দরের ওপর সদর রাস্তার ধারে। তাঁহার চরিত্র মন্দ। রতীশবাবু বড়বাবু অপেক্ষা কিছু বেশিদিনের চাকর। তিনি ধূর্তের শিরোমণি, অসৎকার্যে তাঁহার অদম্য সাহস। মাসিক বেতন পনেরো টাকা। বড়বাবুর নিযুক্তির পূর্বে তিনি অসদুপায়ে মাসে পঞ্চাশ-ষাট টাকা উপার্জন করিতেন। যাচনদার দাগু বিশ্বাস পুরাতন চাকর। সে শয়তানের ওস্তাদ, মাসিক বেতন নয় টাকা। বড়বাবু আসিবার পূর্বে তাহারও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা আয় হইত। নিম্নপদে আর তিন-চার জন চাকর আছে। তাহাদের উপরি আয়ও ঐ অনুপাতে হইত। ভিজা পাট শুকনা বলিয়া চালাইয়া, একশত মণে এক মণ করিয়া পাইকার বেপারিগণের নিকট দস্তুরি ও ঘুষ লইয়া দুষ্টেরা উল্লিখিতরূপে উপরি আয় করিত। এইরূপ করিয়া তাহারা কোম্পানির সমূহ টাকা ক্ষতি করিত। আবার ভিজা পাট চালান দেওয়ার দরুন অনেক সময় কলিকাতার ক্রয়মূল্য অপেক্ষা কমদরে কোম্পানির পাট বিক্রয় হইত। ইহাতেও কোম্পানির অনেক টাকা লোকসান হইত।

নুরুল এসলাম কার্যে নিযুক্ত হইয়া অল্পদিনেই ব্যবসায়ের অবস্থা বুঝিয়া উঠিলেন। নিমকহারাম চাকরদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় কোম্পানি-যে আশানুরূপ লাভ করিতে পারে না, তিনি তাহা টের পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং দুষ্টদিগের কার্যের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে অল্পদিনেই দুষ্টদিগের উপরি আয় বন্ধ হইয়া আসিল। হিংস্র পশুর মুখের গ্রাস সরাইলে তাহারা যেমন রুখিয়া উঠে, ভৃত্যগণ নুরুল এসলামের প্রতি প্রথমত সেইরূপ খড়্গহস্ত হইল। শেষে তাঁহাকে জব্দ ও পদচ্যুত করিবার জন্য নানা ফন্দি পাকাইতে লাগিল। সেই সময় হইতে সামান্য খুঁটিনাটি ধরিয়া তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে আলোচনা আরম্ভ করিল।

বিশ্বস্ততা ও ব্যবসায়নৈপুণ্যে উত্তরোত্তর নুরুল এসলামের পদোন্নতি হইতে লাগিল। তিনি ছয়মাস কাতর থাকায় রতীশবাবু তাঁহার স্থলে কার্য করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে অফিসের সমস্ত চাকরের উপরি আয়ের পুনরায় বিশেষ সুবিধা হইল। এজন্য তাহারা রতীশবাবুর একান্ত অনুগত হইয়া পড়িল। ছয়মাস পরে রোগমুক্ত হইয়া নুরুল এসলাম যখন পুনরায় কার্যগ্রহণ করিলেন তখন ভৃত্যগণের মাথায় যেন আবার বজ্র পড়িল। তাহারা এখন হইতে প্রাণপণ চেষ্টায় নুরুল এসলামের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইল।

২ ❑ ষড়যন্ত্রের শিকার

কয়েকদিন পরে নুরুল এসলাম অফিসে নিয়মিত উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, খরিদ পাটের মূল্যের জন্য দশ-বারো জন বেপারি-অফিস বারান্দায় বসিয়া আছে। তিনি তাহাদিগকে টাকা দেওয়ার জন্য পকেট হইতে লোহার সিন্দুকের চাবি বাহির করিয়া সিন্দুক খুলিতে ক্যাশ-কামরায় প্রবেশ করিলেন। সিন্দুকের ডালা তুলিয়া তন্মধ্যে দৃষ্টিপাতমাত্র তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কারণ, সিন্দুকে ছয় পেটি টাকার মধ্যে দুই পেটি মাত্র আছে, চার পেটি টাকা নাই। প্রথমে মনে করিলেন তিনি ভুল দেখিতেছেন। এইজন্য রুমালে চক্ষু মুছিয়া পুনরায় সিন্দুকের তলায় দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন ভুল নির্ভুল বলিয়া বুঝিলেন। সিন্দুকে চারি পেটি টাকা নাই দেখিয়া দৌড়াইয়া টেবিলের নিকট আসিলেন। ক্যাশ-বুক বাহির করিলেন, হিসাবের খাতা মিলাইয়া দেখিলেন, খরচ বাদে বারো হাজার টাকা তহবিলে আছে। প্রত্যেক পেটিতে দুই হাজার করিয়া টাকা মজুদ আছে। চারি পেটিতে আট হাজার টাকাই নাই। সিন্দুকের চাবিও বরাবর তাঁহার নিকট। খুলিবার আগে সিন্দুকও বন্ধ পাইয়াছেন। তবে এমন হইল কেন? টাকা কোথায় গেল? কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া নুরুল এসলাম ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। বেপারিগণ কহিল, অমন করিতেছেন কেন? আমাদিগকে টাকা দেন। নুরুল এসলাম অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। পরে ধীরভাবে কহিলেন, 'বাপু সকল, একটু থামো।' এই বলিয়া তিনি মাথায় হাত দিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এ জগতে ধর্মভীরু লোক পদে পদে পাপের ভয় করিয়া চলেন। নুরুল এসলামের মানসিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আত্মগ্লানির অনিবার্য হুতাশনে তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও সংকোচিত হইয়া গিয়াছে। আয়ত লোচনযুগল অস্বাভাবিকরূপে প্রদীপ্ত হইয়াছে।

উপস্থিত বেপারিগণ নুরুল এসলামের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আর কিছু বলিতে সাহস পাইল না।

নুরুল এসলাম ক্যাশ-কোঠা বন্ধ করিয়া উত্তেজিতভাবে ম্যানেজার সাহেবের বাংলায় উপস্থিত হইলেন। ম্যানেজার সাহেব তাঁহার মুখের চেহারা দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইলেন। তাড়াতাড়ি কহিলেন, 'নুরুল খবর কী?' ম্যানেজার সাহেব নুরুলকে আন্তরিক বিশ্বাস ও স্নেহ করিতেন, তাই ঐভাবে নাম ধরিয়া ডাকিতেন। নুরুল এসলাম তহবিল তছরূপাতের কথা অসংকোচে খুলিয়া বলিলেন। সাহেব, 'বলো কী' বলিয়া দৌড়িয়া অফিসঘরে আসিলেন। ক্যাশের সিন্দুক পুনরায় খোলা হইল, টাকা গণিয়া দেখা গেল, ক্যাশবুক মিলানো হইল, শেষে আট হাজার টাকাই তহবিলে কম পড়িল। সাহেব নুরুল এসলামকে কহিলেন, 'এখন তোমার বক্তব্য কী আছে?' উপস্থিত রতীশবাবু

বিনা জিজ্ঞাসায় কহিলেন, 'চোরে লইলে সমস্ত টাকাই লইত।' সাহেব বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 'তবে তোমরাই টাকা চুরি করিয়াছ।' রতীশবাবুর মুখ কালিমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, 'হুজুর, চাবি তো বড়বাবুর কাছেই থাকে।' সাহেব কহিলেন, 'হুঁ।' তিনি ক্যাশ-অফিসের প্রহরী ও অন্যান্য চাকরবাকরদিগকে টাকা চুরি সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন জেরা করিলেন, নানাপ্রকার শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিলেন। অন্যান্য প্রকারে অনেক চেষ্টা হেকমত করিলেন, কিন্তু কোনো ফল হইল না। অগত্যা বৈকালে তিনি হেডঅফিসে আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করিলেন। উত্তর আসিল, অপরাধীকে ফৌজদারিতে দাও এবং তাহার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দ্বারা তহবিল পূরণ কর।

ম্যানেজার সাহেব নুরল এসলামকে কহিলেন, 'তুমি টাকা লইয়া কী করিয়াছ?'

নুরল : এরূপ কথা না-বলিয়া আমাকে বধ করুন।

সাহেব : তবে টাকা কে চুরি করিয়াছে ?

নুরল : বলিতে পারি না।

সাহেব : কাহাকেও সন্দেহ কর কি না?

নুরল : সন্দেহ করিয়া কী করিব? চাবি তো আমার কাছেই ছিল।

সাহেব আশ্চর্যভাবে নুরল এসলামের মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন জ্বলন্ত সত্যতা ও সরলতার মধ্যে দিয়া এক অব্যক্ত যন্ত্রণার ভাব আসিয়া তাঁহার আনন্দিত মুখমণ্ডল পরিম্লান করিয়া ফেলিয়াছে।

সাহেব : রতীশ, দাগু প্রভৃতি তোমার বিরুদ্ধে হিংসা পোষে?

নুরল : বিশেষরূপে না-জানিয়া তাদের প্রতি কিরূপে সন্দেহ করিব?

সাহেব মনে মনে তাঁহার সাধুতায় আরও সন্তুষ্ট হইলেন। প্রকাশ্যে কহিলেন, 'তবে তুমি এখন টাকার উপায় কী করিবে?'

নুরল : আপনি আমায় ফৌজদারিতে সোপর্দ করিয়া অতঃপর যাহা ভালো বোধ হয় করুন।

সাহেব : তোমাকে যদি ফৌজদারিতে না-দেই?

নুরল : কর্তৃপক্ষের আদেশ লঙ্ঘন ও টাকার জন্য আপনাকে দায়ী হইতে হইবে।

সাহেব : সেইজন্য বলিতেছি টাকা সংগ্রহের উপায় দেখ।

নুরল : টাকা কোথায় পাইব? ছয়মাস কাতর থাকিয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছি।

সাহেব : তোমার-না তালুক আছে?

নুরল : তালুকে আমার কোনো স্বত্ব নাই।

সাহেব : সে কী কথা?

নুরল : স্ত্রী ও ভগিনীদিগকে হেবা করিয়া দিয়াছি।

সাহেব : নবীন বয়সে এরূপ করিয়াছ কেন?

নুরল : কাতর থাকাকালে মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া।

সাহেব : সমস্ত সম্পত্তি হেবা করিয়াছ?

নুরল : সমস্তই।

সাহেব : ডেপুটি গণেশবাহনবাবুর নিকট শুনিয়াছি তোমার স্ত্রী সীতাসাবিত্রীর মতো সতী। তিনি কি তোমার এ বিপদে তাঁহার সম্পত্তি দিয়া রক্ষা করিবেন না?

নুরল : করিলেও দানের বস্তু প্রতিগ্রহণ করিব না।

সাহেব : তবে কী করিবে?

নুরল : জেলে যাইব।

সাহেব : জেলে যাইতে এত সাধ কেন?

নুরল : জেলে না-গেলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। আমি মহাপাপী।

নুরল এসলাম কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সদাশয় ম্যানেজার সাহেব কহিলেন, 'আমি সামান্য নয়শত টাকা বেতনে চাকরি করি। ছেলের পড়ার খরচের জন্য মাসে পাঁচশত টাকা বিলাতে পাঠাইতে হয়। অবশিষ্ট চারি শত টাকায় আমরা উভয়ে দুঃখেকষ্টে সংসার চালাই। সুতরাং তোমাকে এই বিপদে বেশি কিছু সাহায্য করিতে পারিলাম না। এই পাঁচ কিতা নোট তোমাকে দিলাম, অবশিষ্ট সাড়ে সাত হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া তহবিল পূরণ কর। কলঙ্কের হাত হইতে রক্ষা পাইবে, আর তোমার চাকরি যাহাতে বজায় থাকে আমি তাহা করিব।'

নুরল : তহবিল পূরণ করা আমার অসাধ্য। বাঁচিবার চেষ্টাও আর করিব না। সুতরাং আপনার টাকা লইয়া আমি কী করিব?

সাহেব অনন্যোপায়ে বাধ্য হইয়া তখন থানায় সংবাদ দিলেন। দারোগা আসিলেন। তদন্ত চলিল, কিন্তু আস্কারা হইল না। নুরল এসলাম তহবিল তছরুপাতের আসামি হইয়া জেলায় চালান হইলেন। যাইবার সময় তিনি একখানা পত্র স্ত্রীকে দেওয়ার জন্য একজন বিশ্বস্ত লোকের হাতে দিয়া গেলেন।

৩ ❑ সত্যের সন্ধানে

নুরল এসলাম জেলায় চালান হইবার পূর্বদিন বৈকালে, আমজাদ হোসেন সাহেব তাঁহার নির্জন লাইব্রেরি ঘরে বসিয়া একখানি মাসিক পত্রিকা পড়িতেছিলেন।

এই সময় আমজাদের বালকভৃত্য আসিয়া কহিল, হুজুর সদরবাড়িতে পিয়ন দাঁড়াইয়া।

আম : চিঠিপত্র থাকে তো লইয়া আস।

ভৃত্য : মনিঅর্ডার অনেক টাকার, আর লাল চিঠি একখানা।

আমজাদ শুনিয়া বাহিরবাটিতে আসিলেন। পিয়ন সেলাম করিয়া একখানি পাঁচশত টাকার টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার ফরম ও একখানি লাল চিঠি আমজাদের হাতে দিল। তিনি ফরম সহি করিয়া টাকা লইলেন। লাল চিঠিখানা সেইখানেই খুলিয়া পড়িলেন। তাহাতে লেখা আছে—

> আমাদের আটহাজার টাকার তহবিল তছরুপের জন্য কোম্পানির আদেশানুসারে নুরল এসলামকে ফৌজদারিতে সোপর্দ করা হইল। সে আত্মরক্ষায় রাজি নহে। শুনিয়াছি আপনি তাহার অকৃত্রিম বন্ধু। ওখান হইতে তাহার রক্ষার জন্য যাহা করিতে হয় করিবেন। মোকদ্দমার সাহায্য বাবদ আমি নিজ হইতে তাহাকে পাঁচশত টাকা দিলাম। আশা করি মনিঅর্ডার ও চিঠির কথা আর কাহাকেও বলিবেন না।
>
> সি. ডব্লিউ. স্মিথ
> জুট ম্যানেজার, বেলগাঁও।

বালকভৃত্য টাকাগুলি তোড়া করিয়া বাড়ির মধ্যে লইয়া চলিল। আমজাদ লাল চিঠি হাতে করিয়া নুরল এসলামের আসন্ন বিপদে দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া বিষণ্ণচিত্তে পায়চারি করিতে লাগিলেন।

নুরল এসলাম তহবিল তছরূপাতের আসামি হইয়া হাজতঘরে প্রবেশ করিলেন। আমজাদ যথাসময়ে তাঁহার মুক্তির জন্য ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলেন।

অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া দশ হাজার টাকার জামিন মঞ্জুর করাইয়া জেলখানার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। নুরল এসলামকে আর চেনা যায় না। এই অল্প সময়ের মধ্যে মুখে কালির ছাপ পড়িয়াছে, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, শরীর কৃশ ও দুর্বল হইয়াছে। দেখিয়া আমজাদের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ক্লেশপূর্ণ স্বরে নুরল এসলামকে কহিলেন, 'বাহির হইয়া আইস।'

নুরল এসলাম কহিলেন, 'আমি মুক্তি চাই না, এখানে বেশ আছি, তুমি আমার জন্য এত করিতেছ কেন?'

আমজাদ : 'তাহা পরে হইবে, এখন তো আইস।' এই বলিয়া হাত ধরিয়া হাজতঘর হইতে তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিলেন। তাহার পর গাড়িতে তুলিয়া বাসায় লইয়া আসিলেন। হামিদা ছুটিয়া আসিয়া পর্দার অন্তরাল হইতে সয়াকে দেখিলেন। দেখিয়া তিনিও আঁচলে চোখ মুছিতে লাগিলেন।

অনেক সাধাসাধি করিয়া রাত্রিতে নুরল এসলামকে আহার করানো হইল। আহারান্তে আমজাদ তাঁহাকে লইয়া বৈঠকখানায় বসিলেন।

আমজাদ : তহবিল তছরূপ কিরূপে হইল?

নুরল : পাপের ফলে।

আম : কী পাপ করিয়াছ? স্থানীয় পুলিশ কোনো তদন্ত করেন নাই?

নুরল : আমার বাসাবাড়ি, সেকেন্ড ক্লার্ক রতীশবাবু ও অন্যান্য চাকরদিগের আড্ডা প্রভৃতি অনুসন্ধান করিয়া কোনো কিছু পায় নাই।

আম : রতীশবাবু লোক কেমন?

নুরল : আমার ভয়ে উৎকোচ লইতে পারে না বলিয়া বিদ্বেষপরায়ণ।

শুনিয়া আমজাদ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আবার কহিলেন, 'ক্যাশ কাহার জিম্মায় থাকিত?'

নুরল : আমার জিম্মায়।

আম : চাবি?

নুরল : আমার নিকট।

আমজাদ কী যেন ভাবিয়া আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।

পরদিন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ লইয়া, ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেট ও ইনস্পেক্টর সঙ্গে করিয়া আমজাদ বেলগাঁও চলিয়া গেলেন। পুনরায় অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। জুটঅফিসের আমলা চাকরদিগের প্রত্যেকের বাসাবাড়ি, আড্ডা প্রভৃতি স্থান তন্নতন্ন করিয়া দেখা হইল। অনেককে অনেক প্রকার প্রশ্ন করা হইল। এই কার্যে দুই-তিন দিন গেল। তৃতীয় দিন অফিসের পুষ্করিণীতে জাল ফেলা হইল। ফলে কিছু মাছ পাওয়া গেল আর কিছুই মিলল না। তৎপর পুষ্করিণীতে লোক নামাইয়া দিয়া দলামলা হইল। হাঁড়িপাতিল কিছু উঠিল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব আশাপূর্ণ অন্তরে তাহা ভাঙিয়া চুরিয়া দেখিলেন, কিন্তু সব শূন্য। ঐ তিনদিন গুপ্তানুসন্ধানও চলিল কিন্তু ফল কিছুই হইল না। পুলিশ হতাশ হইয়া পড়িল।

৪ ❑ তিনি বন্দী

নুরল এসলাম জেলায় চালান হইবার সময় স্ত্রীকে যে-পত্র লিখিয়া যান, তাহা যথাসময়ে আনোয়ারার হস্তগত হইল। পত্র দেখিয়া তাহার তুফান ছুটিল। সালেহা এই সময় ঘরে আসিয়া দেখিল, আনোয়ারা জায়নামাজের উপর শুইয়া আছে। সালেহা প্রথমে 'ভাবী' বলিয়া দুই-তিন বার ডাকিল, কোনো উত্তর পাইল না। বালিকা সভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল : 'ফুফুআম্মা, ভাবী মরিয়া গিয়াছে।' ফুফুআম্মা শুনিয়া দৌড়িয়া আসিলেন। প্রতিবেশী অনেক স্ত্রীলোক আসিয়া জুটিল, আনোয়ারার কয়েকটি ছাত্রীও আসিল। ফুফু বউ-এর গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন গা ঠাণ্ডা। নাকে হাত দিলেন, নিশ্বাস চলে, মুখের ভিতর হাত দিয়া দেখিলেন, দাঁতে দাঁত দৃঢ়রূপে লাগিয়া গিয়াছে।

অনেক সেবাশুশ্রূষার পর আনোয়ারার চৈতন্য হইল। ফুফুআম্মা হৃদয়ের ব্যাকুল ভাব চাপিয়া বউকে প্রবোধ দিবার জন্য কহিলেন : 'টাকাপয়সার একটু গোলমাল হইয়াছে, তাহাতেই তুমি এত অস্থির হইয়াছ?' আনোয়ারা কহিল, 'তিনি যে জেলে।'

ফুফুআম্মা কাঁদিতে লাগিলেন।

৫ ❑ কারাদণ্ড

আনোয়ারা যেন কী ভাবিয়া আর সইকে পত্র লিখিল না। উপস্থিত বিপদের কথা উল্লেখ করিয়া মধুপুরে তাহার দাদিমাকে পত্র লিখিল । বৃদ্ধা, হামিদার পিতাকে সঙ্গে দিয়া আনোয়ারার পিতাকে টাকাকড়িসহ রতনদিয়া পাঠাইলেন।

নির্দিষ্ট দিনে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মোকদ্দমা উঠিল। বাদী ম্যানেজার সাহেবের কথায়, আসামি চরিত্রবান বলিয়া প্রমাণিত হইল। কিন্তু উপস্থিত ঘটনায় তিনি যে নির্দোষী তাহা সাব্যস্ত হইল না। রতীশবাবু ও দাগু সাক্ষ্য দিল, নুরল এসলাম দীর্ঘদিন পীড়িত থাকিয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। তারপর কার্যে পুনরায় উপস্থিত হন। ক্যাশসিন্দুকের চাবি সর্বদা তাঁহার কাছে থাকিত।

দারওয়ান জগন্নাথ মিশ্র সাক্ষ্য দিল, টাকা চুরির আগে বড় বড় নিশ্বাস ফেলিতেন আর থাকিয়া থাকিয়া 'রাম রাম' বলিতেন। তাহার কথায় আদালতের লোক হাসিয়া উঠিল।

ম্যাজিস্ট্রেট নানাদিক বিবেচনা করিয়া নুরল এসলামের প্রতি আঠারো মাসের কারাদণ্ডের বিধান করিলেন। হুকুম শুনিয়া তালুকদার ও ভূঞা সাহেব পরিশুষ্ক মুখে ও উকিল সাহেব তাঁহার চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিলেন। বিচারের দিন তালুকদার ও ভূঞা সাহেব কোর্টে উপস্থিত ছিলেন।

পরদিন তালুকদার ও ভূঞা সাহেব রতনদিয়া হইয়া বাড়ি রওয়ানা হইলেন। ভূঞা সাহেব জামাতার সাহায্যের নিমিত্তে বাড়ি হইতে যে সাড়ে চারিশত টাকা লইয়া আসিয়াছিলেন তাহার মধ্য হইতে মাত্র দশ টাকা আনোয়ারাকে দিয়া গেলেন।

তাঁহারা বাড়ি পৌঁছিলে সংবাদ শুনিয়া বৃদ্ধা কাঁদিতে বসিলেন। এদিকে বুকের বেদনা বাড়িয়া আনোয়ারা একেবারে শয্যাশায়ী হইল।

৬ ❑ শাড়ি কিনিতে আসিল

নুরল এসলাম কারাগারে যাইবার পর, কোম্পানির টাকা আদায়ের নিমিত্ত সদর হইতে একজন কর্মচারী বেলগাঁও আসিলেন। ম্যানেজার সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, আসামির সম্পত্তি যাহা ছিল সে তাহা পূর্বেই ভগিনী ও স্ত্রীকে দান করিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার নিকট টাকা আদায় অসম্ভব। এখন অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যাহা হয়। কিন্তু রতীশবাবু পূর্বকথিত নবার নিকট শুনিয়া, স্থানীয় রেজিস্টারি অফিসে খোঁজ করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন—নুরল এসলাম দানপত্র রেজিস্টারি করিয়া দেন নাই। তিনি কর্মচারীকে গোপনে বলিলেন, আসামির দানপত্র এ পর্যন্ত রেজিস্টারি হয় নাই, সুতরাং এখন সে সম্পত্তি আসামির বলিয়া নালিশ করিতে পারেন। কর্মচারী ম্যানেজার সাহেবের নিকট আসামির নামে সেই সূত্রে নালিশের প্রস্তাব করেন। উকিল সাহেবের পত্র পাইয়া শয্যাশায়িনী আনোয়ারা বুকের ব্যথা বুকে চাপিয়া উঠিয়া বসিল। সকলে মনে করিল বউ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে।

আনোয়ারা সংক্ষেপে তাহার দাদিমাকে পত্র লিখিল—

> তোমরা সকলে আমার সালাম জানিবে। বাপজান আমাদের বিপদে এখানে আসিয়া মাত্র দশটি টাকা দিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে কোম্পানি আমাদের তালুক বিক্রয় করিয়া টাকা লইতে চেষ্টা করিতেছে। অতএব এই চিঠি পাওয়া মাত্র তুমি নিজ হইতে তিনশত, বাপজান তিনশত, আমার পুঁজি টাকা চারিশত এবং কয়েকখানি শাড়ি ও তোমার প্রদত্ত আমার সমস্ত গহনা বিলম্ব না করিয়া পাঠাইবে। যদি ঐ সকল পাঠাইতে ইতস্তত বা বিলম্ব কর, তবে আমাকে আর জন্মের মতো দেখিতে পাইবে না।
>
> ইতি—
> তোমার সোহাগের
> *আনোয়ারা*

স্নেহপরায়ণা বৃদ্ধা পৌত্রীর আত্মহত্যার আশঙ্কা করিয়া অগৌণে বস্ত্রালঙ্কার ও নগদ টাকা পাঠাইলেন। মাত্র দশটি টাকা মেয়েকে দিয়া আসিয়াছে জানিয়া বৃদ্ধা পুত্রকে তিরস্কার করিলেন এবং তাহার নিকট হইতে তিনশত টাকা লইয়া তাহাও এই সঙ্গে পাঠাইলেন। আনোয়ারা যথাসময়ে টাকা, অলঙ্কার ও বস্ত্র পাইল।

এদিকে আনোয়ারা উকিলসাহেবকে রতনদিয়ায় আসতে সই-এর নিকট পত্র লিখিল। উকিলসাহেব যথাসময়ে রতনদিয়ায় আসিলেন। দিনমানে তিনি দোস্তের সংসারের সিজিল মিছিল করিলেন। রাত্রিতে কোম্পানির দেনাশোধের কথা তুলিলেন। সরলা ফুফুআম্মা কহিলেন : 'বাবা, তুমি যাহা ভালো বুঝ তাহাই কর।' উকিলসাহেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন : 'টাকা দুই তিন হাজার নয়, আট হাজার। তালুক বিক্রয় ছাড়া উপায় দেখিতেছি না।' আনোয়ারা ফুফুশাশুড়ির নিকট ঘরের ভিতর বসিয়াছিল, সে ছোট করিয়া ফুফুশাশুড়িকে কহিল : তা কেন, আমার নিকট হাজার টাকা ও আমার এগারো শত টাকার গহনা আছে। পীড়ার সময় সই আমাকে একশত টাকা দিয়াছিল, তাহাও মজুদ আছে। এইসব দিয়া কোম্পানির টাকা মিটাইতে বলেন।

ফুফু বউ-এর সমস্ত কথা উকিলসাহেবকে শুনাইলেন। উকিলসাহেব শুনিয়া বালিকার পতিপরায়ণতায় মনে মনে ধন্যবাদ দিলেন।

গহনার কথা শুনিয়া তিনি বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা ইতঃপূর্বে যে এগারো শত টাকার অলঙ্কারের কথা বলিলেন তাহা কাহার?' ফুফুআম্মা কহিলেন, 'ওগুলো বউমার দাদিমা দিয়াছিলেন।' উকিলসাহেব শুনিয়া মনে মনে কহিলেন : সতী তুমিই ধন্য। তুমিই পতিব্রতাদিগের আদর্শস্থানীয়া।

উকিলসাহেব কহিলেন, 'নগদে ও গহনায় তিন হাজার একশত হইতেছে, বাকি চারি হাজার নয় শত টাকা। তার উপায় কী?' আনোয়ারা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে ফুফুআম্মাকে কহিল, 'আমার হাতে এখন ষাট টাকার অঙ্গুরী আছে।'

এইবার উকিলসাহেব কহিলেন : 'আপনারা কান্নাকাটি করিবেন না, আপনাদের পাঁচশত টাকা আমার কাছে মজুদ আছে, ম্যানেজার সাহেব মোকদ্দমার সাহায্যের জন্য আমার হাতে দিয়েছিলেন, তাহাও এই দেনায় শোধ দিন।' আনোয়ারা মোট উনচল্লিশ শত ষাইট নগদে-গহনায় দেনাশোধের জন্য উকিল সাহেবের হাতে দিল। তিনি ঐ সকল লইয়া যথাসময়ে বাসায় আসিলেন।

উকিলসাহেব বাসায় পৌঁছিলে হামিদা কহিল, 'এত টাকা ও গহনা কোথায় পাইলে?'

উকিল : তোমার সই যথাসর্বস্ব আমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন।

হামিদা : আর কত হইলে দেনা শোধ করিতে পারিবে?

উকিল : কমপক্ষে মোট সাড়ে চারি হাজার টাকা হইলে কথা বলা যায়।

হামিদা : আমি খোকার মুখে ক্ষীর দেওয়া উপলক্ষে তিনশত টাকা জমাইয়াছি। তোমার অনুমতি হইলে তাহা হইতে দিতে চাই।

উকিল : তোমার হৃদয়ের মহত্ত্ব দেখিয়া সুখি হইলাম।

অতঃপর জুট ম্যানেজারের সহিত অনেক লেখালেখি হওয়ার পর তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহে চারি হাজার টাকায় কোম্পানির টাকা শোধ সাব্যস্ত হইল। বন্ধুর তালুক ও বন্ধুপত্নীর গাত্রালঙ্কার যাহাতে পরভোগ্য না-হয়, তজ্জন্য উকিলসাহেব নিজনামে হাজার টাকার হ্যান্ডনোট লিখিয়া দিয়া এবং বাকি টাকা নিজ হইতে দিয়া কোম্পানির রফার টাকা শোধ করিলেন। স্ত্রীকে হ্যান্ডনোটের কথা জানাইয়া কহিলেন, 'অলঙ্কারগুলি সযত্নে তুলিয়া রাখো, সময়ে ফেরত দেওয়া যাইবে।' হামিদা আহ্লাদে গহনাগুলি বাক্সে পুরিল।

জুট কোম্পানির টাকা শোধের পর, একদিন রাত্রিতে শয়ন করিয়া ফুফু আনোয়ারাকে কহিলেন : 'বউমা, এখন উপায় কী?' আনোয়ারা শোক নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল : টাকা পয়সা সব গেল। আশ্বিন মাস না আসিলে তালুকের খাজনা পাওয়া যাইবে না।

বিকালবেলায় নবার বৌ এই বাড়িতে বেড়াইতে আসিল। নবার বৌ ঘরে আসিলে আনোয়ারা পোটম্যান খুলিয়া একখানি রেশমের ওপর পদ্মফুল তোলা নীলাম্বর শাড়ি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিলেন, 'তোমার সোয়ামীকে দিয়া শাড়িখানা বিক্রয় করিয়া দিবে?'

নবার বৌ সহৃদয়তা জানাইয়া কহিল, 'আপনারা বড় লোক, শাড়ি বেচবেন ক্যান?'

আনো : আমাদের টাকা পয়সার খুব টানাটানি হইয়াছে।

নবার বৌ : দাম কত চান?

আনো : পনরো-কুড়ি টাকা। এখন অর্ধেক দামে দিব।

নবার বৌ : খুইল্যা দেহান তো?

আনোয়ারা শাড়ি খুলিয়া দেখাইল। কিছুদিন ব্যবহার হইলেও বিচিত্র বেনারসী শাড়ি দেখিয়া নবার বৌ-এর চোখ ঝলসিয়া গেল। সে শাড়ির জন্য উন্মত্তা হইয়া উঠিল। কিন্তু সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ায় কহিল : আজ থাক, কাইল লইয়া যামু।

নবার বৌ চলিয়া গেল।

রাত্রিতে নবা বেলগাঁও হইতে আসিল। নবার বৌ পূর্বেই তাহাকে শাড়ির ফরমাশ দিয়াছিল। বাড়ি আসিবামাত্র বউ নবাকে কহিল, 'আমার শাড়ি কই?'

নবা কহিল, 'রতীশবাবু কলকাতা থাইকা আইলেই শাড়ি পাব।'

নবার বৌ মুখভার করিয়া রাত্রিতে অনেকক্ষণ কথাবার্তা কহিল না। নবা অনেক সাধ্যসাধনা করায় বৌ শেষে অভিমানের নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল : আচ্ছা, আমাকে বুঝি বিশ্বাস পাও না।

প্রাতে নবা বন্দরে গেল। নবার বৌ বাক্স খুলিয়া আটকুড়ি সাত টাকা লইয়া শাড়ি কিনিতে চলিল।

আনোয়ারা তখন কোরান পাঠ করিতেছিল।

নবার বৌ টাকাগুলি পায়ের কাছে ঢালিয়া দিয়া কহিল, 'শাড়ি দ্যান।'

আনোয়ারা টাকা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। কোরান পাঠ বন্ধ করিয়া কহিল, 'তোমরা গরিব মানুষ, এত টাকা কোথায় পাইলে?'

নবার বৌ মিশিরঞ্জিত দন্ত বিকশিত করিয়া কহিল, 'খোদায় দিছে।'

আনো : তা তো সত্যি, কিন্তু খোদা কেমন করিয়া দিল।

নবার বৌ ইতস্তত করিতে লাগিল। আনোয়ারা ভরসা দিয়া কহিল : 'আমার কাছে বলিতে ভয় কী?' নবার বৌ তথাপি ইতস্তত করিতে লাগিল। আনোয়ারা তখন কহিল, 'তুমি টাকার কথা না-বলিলে আমি তোমাকে শাড়ি দিব না।' নবার বৌ শাড়ির জন্য পাগল। সে এদিক-ওদিক চাহিয়া কহিল, 'আমার বাড়িআলা এক ছালা ট্যাহা পইরা পাইছে।'

আনো : কোথায় পাইয়াছে?

নবার বৌ : সাহেবের পুষ্করিণীতে রাতে মাছ মারতে যায়।

আনোয়ারা শুনিয়া অনেকক্ষণ কী যেন চিন্তা করিল। পরে দশ টাকা ফেরত দিয়া শাড়ির কথিত মূল্য একশত আটান্ন টাকা রাখিয়া শাড়ি দুইখানি নবার বউ-এর হাতে দিল। সে মহানন্দে শাড়ি লইয়া প্রস্থান করিল।

৭ □ নবা'র স্বীকারোক্তি

আনোয়ারা শাড়ি বিক্রয়ের তিনদিন পর জেলা হইতে জনৈক নামজাদা পুলিশ ইনস্পেক্টর রতনদিয়ায় আসিয়া হঠাৎ নবাব আলীর বাড়ি ঘেরাও করিলেন। নবাব আলী ওরফে নবা।

নবা বন্দরে যাইতে বাড়ির বাহির হইতেছিল। পুলিশ দেখিয়া তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। জনৈক কনস্টেবল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কী?

নবা : হুজুর, কর্তা, আমার নাম আমার না—ম—নবা। না, আমার নাম, কর্তা মহাশয়, নবাব আলী শ্যাক।

ইনস্পেক্টরের ইঙ্গিতে কনস্টেবল নবাব আলীর হাত চাপিয়া ধরিল। নবার মুখ দিয়া তখন ধুলা উড়িতে লাগিল। সে মনে করিতে লাগিল সমস্ত দুনিয়াটা বুঝি তাহার বিপদে ওলটপালট খাইতেছে। সে এখন দিশাহারা, তথাপি সাহস অবলম্বনে, কনস্টেবলকে কহিল : আপনি হুজুর কর্তা, আমার হাত চাইপ্যা ধল্লেন কেন? ছাড়েন, না ছাড়লে আমি এহনি এই দারোগাবাবুর কাছে নালিশ কইর‍্যা দিমু।

ইন : (স্মিতমুখে) কী বলে নালিশ করবি?

নবা : হুজুর, আমার বাপদাদা দুই পুরুষে কেউ চোর হয় নাই। আমিও চোর না। তবে কিছু ট্যাহা পইরা পাইছি, তা চান তো এহনি বার কর‍্যা দিতেছি।

কনস্টেবল সঙ্গে গিয়া নবার টাকার বাক্স বাহিরে আনিল। সর্বসম্মুখে খোলা হইল, বাক্সে মাত্র দুইশত টাকা পাওয়া গেল। আর একটি ছোট রকমের টিনের বাক্স খোলা হইল। তাহা হইতে একখানি বেনারসী ও একখানি নীলাম্বরী শাড়ি আর তেরোটি টাকা বাহির হইল। এই বাক্সটি নবা তাহার স্ত্রীকে ভালোবাসিয়া খরিদ করিয়া দিয়াছিল। ইনস্পেক্টর নবাকে কহিলেন : 'তোর বউ বেনারসী পরে, আর তুই বলিস আমি চোর না।' শাড়ি দেখিয়া নবার মাথা ঘুরিয়া গেল। কারণ সে এই শাড়ির বিষয় কিছুই অবগত নয়। সে একটু সামলাইয়া কহিল, 'হুজুর আমি শাড়ির কথা কিছুই জানি না।'

ইনস্পেক্টরের আদেশে তাঁহার অনুচরগণ নবার বাড়িঘর তন্নতন্ন করিয়া দেখিল, কিন্তু কিছু পাইল না। শেষে তাহার শয়নঘরের মেঝে খুঁড়িতে খুঁড়িতে এক পাতিল টাকা বাহির হইল। গুণিয়া দেখা গেল সতের শত। ইনস্পেক্টর ক্রোধভরে নবাকে কহিলেন, 'আট হাজারের মধ্যে উনিশ শত তেরো টাকা পাওয়া গেল। আর টাকা কোথায় আছে, ভালো চাহিস তো খুলিয়া বল।'

নবা : হুজুর, এখন কাইট্যা ফেলালেও আর নবার ঘরে এক পয়সা পাইবেন না।

পুলিশ-অনুচরগণ নবার বাড়ি তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া বাস্তবিকই আর কিছু পাইল না।

ইন : তুই এত টাকা কোথা হইতে চুরি করিয়াছিস?

নবা : হুজুর আমি চোর না। ট্যাহ্য পইরা পাইছি।

ইন : কোথায় পেয়েছিস বল্। ঠিক কথা বলিলে তোকে ফাটকে দিব না।

নবা : হুজুর, বাপ, যদি গোলামকে বাঁচান, তবে সব খুইল্যা কই।

ইন : বল্ তোর কোনো ভয় নাই।

নবা : যেদিন আমার মুনিবরে জেলায় ধরে লিয়া যায়, হেইদিন রাতে আমি সায়েবের পুষ্করিনিতে মাছ মারতে গেছিলাম। পশ্চিমপারে জাল দিয়া মাছ মারতেছি। দেহি তিনজন মানুষ অফিসের ঘাট দিয়া নাইমে আইসে একজন পানিতে নামল। তারপর কী যেন তুইলে ওপরের দুইজনের মাথায় দিল, আর নিজেই একটা নিল। তারপর তিনজনাই ওপরে উঠে গ্যাল। আমি পানিতে মিইশ্যা থাইকা দেহলাম।

ইন : তিনজন কে কে?

নবা : কালছা আঁধারে চেনা গেল না।

ইন : তুই তখন কী করলি?

নবা : তারা চইল্যা গ্যালে আমি আস্তে আস্তে পুবপারে যাইয়া দ্যাহি পানির কিনারে কী যেন উঁচা হয়া আছে। হাত দিয়া দ্যাহি ট্যাহর ছালা। আমি তাই মাতায় কইরা বাড়ি আনছি।

ইন : এই তিনটে লোককে কি একেবারেই চিনতে পারিস নাই?

নবা : হুজুর, পরে পারচি।

ইন : (সোৎসাহে) কে কে?

নবা : রতীশবাবু আর দাগুমামু।

ইন : তারা যে চুরি করিয়াছে কেমন করিয়া বুঝিলি?

নবা : আমি হেইদিন ভোরে বাড়ি হইতে আইসে সায়েবের পুষ্কন্নিতে মুখ ধুইতে গেছিলাম। দ্যাহি রতীশবাবু আর দাগুমামু পুষ্কন্নিতে রাতের হেই জায়গায় খাড়া হয়া কী যেন বলাকয়া করতেছে। আর রতীশবাবু ট্যাহার জায়গায় হাত ইশারা কইরা কী যেন দেহাইতেছে। ওগার ওপর আমার ভারি সোন্দ হইল, কিন্তু ভাবলাম আর একজন কে? ধরার জন্যি তাহে তাহে থাকলাম।

এই পর্যন্ত বলিয়া নবা থামিয়া গেল।

ইন : তার পর আর কোনো খোঁজ করিতে পারিস নাই?

নবা : হুজুর, আমাকে ছাইড়া দিবেন তো?

ইন : হাঁ, হাঁ, তুই যদি সব কথা সত্য করে খুলে বলিস, তবে তোকে বেকসুর খালাস দিব।

নবা : তবে কই, হোনেন। আমরা তিন-চারি জন গরিব মানুষ পাট বাঁধাই করি। রতীশবাবুর বাসার নিকট আমাগোর বাসা।

ইন : রতীশবাবু কি পরিবার লইয়া থাকেন?

নবা : নলিনী বৈষ্টমীর বাড়িতে থাহেন।

ইন : থাক্, আসল কথা বল্।

নবা : হুজুর, আমি এ্যাকদিন বেশিরাত জাইগ্যা বাসায় বইসে আছি, পাশে রতীশবাবুর বাসায় তেনি, দাগুমামু আর ফরমান তিনজন মানুষের কথা শুইনা কানখাড়া কল্লাম। দাগুমামু এই কইতাছে—'বাবু, যে ছালা আলাদা বালুতে গাড়া হইচিল, তা আপনি আগে চালাকি কইরা তুইল্যা আনচেন। তার অংশ আমাকে না দিলে আমি সব ফাঁসায়া দেব।' রতীশবাবু কইল—'না দাগুভাই, আমি কালীঠাকবুনের দিব্যি কইর‍্যা কইতে পারি আমি তা আনি নাই।' দাগুমামু তখন ফরমানভাইকে কইলেন—'এ-কাজ তবে তুমিই করচ?' ফরমান ভাইও তখন রাগের মুখে কইল—'আমাকে অত শয়তান মনে কইর না। চিনির বলদের মতো বোঝা বওয়াইয়া মোট পাঁচগণ্ডা ট্যাহা দিতে চাও, খোদায় এ্যার বিচার করব।' রতীশবাবু হাইসে কইলেন—'নেও ফরমান, তুমি আর আপত্তি কইর না, এ্যাক ঘণ্টায় এক কুড়ি, আর কত?' ফরমান কইলেন—'বাবু আপনারা যে ছালায় ছালায়, আমি যদি ফাঁসায়ে দিই?' দাগুমামু কইল, 'কয়া দিয়া আর কী ঘণ্টা করবা? মোকদ্দমা তো মিট্যা গ্যাছে। তারজন্যি বড়বাবুর ফাটক হইচে।' রতীশবাবু কইলেন, 'আমার মনে কয়—যে জলের ছালা চুরি করচে, সেই বালুতে গাড়া আলাদা ছালা নিছে।'

দূরদর্শী ইনস্পেক্টর নবাকে আর প্রশ্ন করা আবশ্যক বোধ করিলেন না। নবাকে সঙ্গে করিয়া সদলে বেলগাঁও উপস্থিত হইলেন।

ইনস্পেক্টর সাহেব নলিনী, রতীশ, দাগু ও ফরমানকে স্থানীয় পুলিশের হেফাজতে পৃথক বন্দী করিয়া রাখিয়া স্নানাহারের জন্য ডাকবাংলায় উপস্থিত হইলেন।

আহারান্তে ইনস্পেক্টর সাহেব জোহরের নামাজ পড়িয়া খানাতল্লাশি আরম্ভ করিলেন। অগ্রে নলিনী বৈষ্ণবীর বাড়ি দেখা হইল। তাহার ঘরে নূতন লোহার সিন্দুক ও নূতন মজবুত স্টিলট্রাঙ্ক।

সিন্দুক ও বাক্সের চাবি নলিনীর নিকট চাওয়া হইল। নলিনী ঝাড়িয়া জবাব দিল : 'চাবি নাই, হারাইয়া গিয়াছে।' ইনস্পেক্টর কহিলেন : 'শয়তানী ছাড়ো, চাবি দাও।'

নবা : চাবি রতীশবাবুর কাছে। আমি তার কোমরে অনেকবার বড় ছোরানী দেখচি।

তখনই রতীশবাবুর নিকটে পুলিশ গেল। বাবু চাবি লুকাইতে সময় পাইলেন না। অগত্যা বাহির করিয়া দিলেন। চাবি দুইটি পাইয়া ইনস্পেক্টর নবার প্রতি খুশি হইলেন। লোহার সিন্দুক খোলা হইল। তন্মধ্যে নগদ দুই হাজার টাকা ও পাঁচশত টাকার নোট পাওয়া গেল। স্টিলট্রাঙ্ক হইতে নগদ চারিশত টাকা এবং কুড়ি ভরি পাকা সোনা বাহির হইল। ইনস্পেক্টর নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন : 'আর টাকা কোথায় রাখিয়াছ?' নলিনী নিরুত্তর।

নলিনীকে হাতকড়া দিয়া থানায় হাজতে পুরা হইল। রতীশবাবুর বাসাবাড়ি খানাতল্লাশি করিয়া কিছু পাওয়া গেল না। শেষে ফরমানকে ধরা হইল।

ফরমান পূর্বকথিত গণেশের ন্যায় সজ্ঞান বাচাল। ছোটবেলায় সে গ্রাম্যস্কুলে লেখাপড়া শিখিয়াছিল। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ, তাই দাগু যাচনদারের সহকারিতা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। সে ইনস্পেক্টর সাহেবকে দেখিয়াই লম্ফঝম্ফ দিয়া বলিতে লাগিল : হুজুর বুঝি খোদ ধর্মরাজ। ধর্মমাহাত্ম্য দেখাইতে আসিয়াছেন।

ইনস্পেক্টর সাহেব হাসিয়া কহিলেন : তোমাকে ভালো লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। মিথ্যাকথা বলিও না, ঠিক করিয়া বলো, তুমি কত টাকা চুরি করিয়াছ?

ফর : হুজুর, ভালো লোক কি চুরি করে? তা যদি হয় তবে হুজুরকে চোর বলা যায়।

ইনস্পেক্টর সাহেব পুলিশ-প্রভুদিগের ন্যায় অগ্নিশর্মা না হইয়া কার্যোদ্ধারের নিমিত্ত কহিলেন, 'টাকার লোভে ভালো লোকও চোর হয়।'

ফর : তা হুজুরদিগের দলেই জেয়াদা।

ইন : তবে তুমি টাকা চুরি কর নাই?

ফর : এক পয়সাও না।

ইন : তবে কোম্পানির এত টাকা কে চুরি করিয়াছে?

ফর : হুজুর, সেই কাণ্ডকারখানা আপনি শুনিলে তাজ্জব হইবেন। আমি সত্য ছাড়া একবিন্দুও মিথ্যা বলিব না। আহা! হুজুর যদি হোমরাচোমরাদিগের আগে আসিতেন, তবে বড়বাবুর ফাটক হইত না। হুজুর তাঁহার মতো ভালো লোক এদেশে নাই। আমার মনে হইলে তাঁহার জন্য কান্না আসে।

ইন : কে কে টাকা চুরি করিয়াছে?

ফর : রতীশবাবু আর দাগু।

ইন : কেমন করিয়া চুরি করিল?

ফর : যেদিন দুষ্টেরা টাকা চুরি করে, সেইদিন শনিবার ছিল। বড়বাবুর মন আগে থাকিতেই কী কারণে যেন খারাপ হইয়াছিল। কাজকাম উদাসভাবে করিতেন, ভুলভ্রান্তি খুবই হইত।

ইন : কী কাজে ভুল করিতেন?

ফর : তাই তো বলিতেছি, শুনেন না।

ইনস্পেক্টর সাহেব রাগ করিয়া কহিলেন : বাচলামি রাখো, কেমন করিয়া কে কে টাকা চুরি করিয়াছে তাহাই বলো।

ফর : ভাবিয়াছিলাম আপনি বুঝি সক্রেটিস, তা এখন টের পাইলাম আপনি বাবা শা-ফরিদের দাদা।

ইন : (ফরমানের দিক চাহিয়া) তুমি ওসব নাম কিরূপে জানো?

ফর : আপনি কি আমাকে চাষা মনে করেন?

ইন : (হাস্য করিয়া) না, না, তুমি বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

ফর : তবে শুনুন, সেই দুপুরের পর বড়বাবু আফিসঘর হইতে মসজিদে নামাজ পড়িতে গেলেন। দাগু বেটা আমাকে কহিল, ফরমান তুমি মসজিদের পথ আগলিয়া দাঁড়াইয়া থাকো, বড়বাবু মসজিদ হইতে বাহির হইলেই আমাদিগকে সংবাদ দিবে। যদি জানিতাম বড়বাবু ভুলে টেবিলের ওপর ক্যাশবাক্সের চাবি রাখিয়া নামাজ পড়িতে গিয়াছেন, আর শালারা সেই অবসরে সিন্দুক খুলিয়া ছালা বোঝাই টাকা পুষ্করিণীতে ডুবাইয়াছে, তাহা হইলে কি আমি তাদের কথায় ভুলি? এমন বিশ্বাসঘাতক কাজের কথা জন্মেও শুনি নাই, দেখা তো দূরের কথা।

ইন : ঐরূপ ভাবে যে চুরি হইয়াছে, তুমি কতদিন পরে কেমন করিয়া জানিলে?

ফর : বড়বাবুর জেল হওয়ার পর চোরদের মুখেই শুনিয়াছি।

ইন : তোমরা পুষ্করিণী হইতে টাকা কবে তুলিয়া বালুচরে রাখিয়াছিলে?

ফর : যেদিন বড়বাবু জেলায় চালান হইয়া যান সেই রাত্রিতে।

ইন : তোমাকে কত টাকা দিয়াছিল?

ফর : মাত্র কুড়ি টাকা।

ইন : তোমাকে তো ঠকাইয়াছে?

ফর : হুজুর, না ঠকাইলে ফরমান মিঞার কাছে এত খবর পাইতেন কি না, সন্দেহের কথা বলিয়া মনে করুন।

ইনস্পেক্টর সাহেব অতঃপর দাগুকে ধরিয়া কহিলেন, 'কোম্পানির টাকা চুরি করিয়া কোথায় রাখিয়াছ?'

দাগু : আমি কেন টাকা চুরি করিব?

ইনস্পেক্টর সাহেব ঘড়ি দেখিয়া দাগুকে কহিলেন : চলো, তোমার বাড়িতে যাইব।

দাগুর মুখ শুকাইল। অনুচরেরা দাগুকে বাঁধিয়া লইয়া ইনস্পেক্টর সাহেবের পশ্চাদগামী হইল।

দাগুর বাড়ি তন্নতন্ন করিয়া দেখা হইল, কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। ইনস্পেক্টর সাহেব হতাশ হইয়া ফিরিতে উদ্যত হইলেন। ফরমান সঙ্গে ছিল। সে ইনস্পেক্টর সাহেবকে কহিল, 'হুজুর একটা জায়গা দেখা বাকি আছে। আমি গল্পে শুনিয়াছি, সেয়ানা চোরেরা চুরির মাল চুলার নিচে রাখে।' ফরমানের কথা ইনস্পেক্টর সাহেবের মনে ধরিল। তিনি দাগুর রান্নাঘরের চুলা খুঁড়িতে অনুচরগণকে আদেশ করিলেন। আদেশানুসারে কার্য চলিল। চুলার অনেক নিচে মুখবন্ধ একটি তামার ডেকচি পাওয়া গেল। তুলিয়া দেখা গেল, পুরা দুই হাজার টাকা পাত্রে রহিয়াছে। ইনস্পেক্টর সাহেব উল্লসিত হইয়া কহিলেন, 'ফরমান, তুমি বাঁচিয়া গেলে।'

ফরমান : আপনার মুখে ধানদূর্বা।

অতঃপর ইনস্পেক্টর সাহেব অনুমান করিলেন বালুচরে পৃথকভাবে পোঁতা যে একছালা টাকার জন্য রতীশবাবু কালী ঠাকরুনের শপথ করিয়াছেন, নবা বলিয়াছে সে টাকা রতীশবাবুই চোরের ওপর বাটপারি করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন।

রতীশবাবু যখন অবশিষ্ট টাকার কথা মোটেই স্বীকার করিলেন না, তখন ইনস্পেক্টর সাহেব স্থানীয় পোস্টঅফিসে উপস্থিত হইয়া মাস্টারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানকার পাট অফিসের কেরানি রতীশবাবু দুই-এক সপ্তাহের মধ্যে সেভিংস ব্যাকে টাকা জমা দিয়াছেন কি না অথবা মনিঅর্ডার কোথাও পাঠাইয়াছেন কি না? পোস্টমাস্টারবাবু খাতাপত্র দেখিয়া কহিলেন: হাঁ, চারিশত টাকার মনিঅর্ডার করিয়াছিলেন এবং চারিশত টাকা ব্যাংকে জমা দিয়াছেন।

ইন : কোথায় মনিঅর্ডার করিয়াছে?

পোস্ট : বাড়িতে তাঁহার পিতার নিকট।

রতীশবাবুর সহিত পোস্টমাস্টারের জানাশোনা ছিল। ইনস্পেক্টর সাহেব রতীশবাবুর পিতার নাম জানিয়া তখনই তার করিলেন :

চারি শত টাকার মনিঅর্ডার পাঠাইয়াছি, এ পর্যন্ত প্রাপ্তি সংবাদ রসিদ না পাইয়া চিন্তিত আছি।
ইতি—
রতীশচন্দ্র—বেলগাঁও।

উত্তর আসিল, টাকা পাইয়াছি।

ইনস্পেক্টর সাহেব তখন আপন আনুমানিক কার্যের সত্যতা দেখিয়া খোদাতায়ালাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। এইরূপে চুরির আস্কারা করিয়া ইনস্পেক্টর সাহেব ডাকবাংলায় চলিয়া গেলেন।

তিনি ডাকবাংলায় উপস্থিত হইলেন, জুটম্যানেজার সাহেবও তথায় আসিলেন।

ম্যানে : কল্পনার অতীত এমন জটিল চুরি আপনি কিরূপে আস্কারা করিলেন?

ইন : ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই।

ম্যানে : তবে কাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে এমন ডাকাতি ধরা পড়িল?

ইন : আপনারা যে নির্দোষ ব্যক্তিকে জেলে দিয়াছেন, তাঁহার সহধর্মিণীর সন্ধানে। আপনাদের তহবিল তছরূপাতের টাকা শোধের জন্য সতী গাত্রালঙ্কার প্রভৃতি বিক্রয়করত শেষে উদরান্নের জন্য পরিধেয় শাড়ি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সূত্রে চোরের সন্ধান হয়।

আসামি রতীশ সরকার ও দাগুকে বিশ্বাসঘাতকতা ও চুরির অপরাধে দশ বৎসর, পৃষ্ঠপোষক নলিনীর প্রতি তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বিধান করা হইল। ইনস্পেক্টর সাহেবের বিশেষ অনুগ্রহে নবা ও ফরমান বাঁচিয়া গেল। সঙ্গীন চুরি আস্কারা করার জন্য নুরুল এসলাম সাহেবের স্ত্রী গভর্নমেন্ট হইতে পুরস্কারপ্রাপ্তির যোগ্যা, জজসাহেব রায়ের উপসংহারে এ-কথা উল্লেখ করিতে ত্রুটি করিলেন না।

প্রকৃত অপরাধীগণ ধরা পড়িয়া শাস্তি পাওয়ায় আপিলে নুরুল এসলাম বেকসুর খালাস পাইলেন।

৮ ❑ গোয়েন্দাগিরির পুরস্কার

দেখিতে দেখিতে ছয়মাস অতীতের গর্ভে বিলীন হইল। তারপর আর এক দুর্ঘটনায় আনোয়ারার হৃদয় ভাঙিয়া পড়িল। তাহার সংসার জীবনের শ্রেষ্ঠতম অবলম্বন দাদিমার মৃত্যু

হইল। বৃদ্ধা মৃত্যুর সময় আপন গাত্রালঙ্কার যাহা এতকাল সিন্দুকে পুরিয়া রাখিয়াছিলেন, সমস্ত আনোয়ারাকে দিয়া গেলেন। নুরল এসলামের কারামুক্তির পর গভর্নমেন্ট জুট কোম্পানির অপহৃত আট হাজার টাকা ম্যানেজার সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন। ম্যানেজার সাহেব পূর্বেই উকিলসাহেবের নিকট অপহৃত চারি হাজার টাকা বুঝিয়া পাইয়া নুরল এসলামকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি তাঁহার মহত্ত্বের নিদর্শনস্বরূপ গভর্নমেন্ট হইতে প্রাপ্ত আট হাজার টাকার এক হাজার টাকা মাত্র মোকদ্দমায় ব্যয়স্বরূপ রাখিয়া অবশিষ্ট সাত হাজার টাকা নুরল এসলামকে ফেরত দিলেন। নুরল এসলাম টাকাগুলি লইয়া স্ত্রীর নিকট দিয়া কহিলেন : এই টাকা হইতে তোমার নগদ দেওয়া টাকা বুঝিয়া লও। অবশিষ্ট টাকা দোস্ত সাহেবকে দিতে হইবে। তিনি আমার জন্য যাহা করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই, তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য।

আনোয়ারা হাসিয়া কহিল : আচ্ছা টাকা লইলাম কিন্তু এ টাকা এক্ষণে আমি আর কাহাকেও দিব না। আমার একটা প্রার্থনা শুনিতে হইবে।

নুরল সোৎসাহে কহিলেন : তোমার আদেশ উপদেশ আমার শিরোধার্য।

আনোয়ারা কহিল : আপনাকে আর আমি কোম্পানির চাকরি করিতে দিব না। এই টাকা আর দাদিমার হাজার টাকা লইয়া আপনি স্বাধীনভাবে ব্যবসা আরম্ভ করুন।

নুরল এসলাম স্ত্রীর বৈষয়িক যুক্তিবুদ্ধির কথা শুনিয়া মনে মনে খোদাতালাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

এই সময় একদিন নুরল এসলাম ইনসিওর রেজিস্টারি পার্শ্বেল ডাকপিয়নের নিকট পাইলেন। খুলিয়া দেখিলেন, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট চোরের অনুসন্ধান করিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহার স্ত্রীকে পুরস্কারস্বরূপ তিনশত টাকা মূল্যের একছড়া হার ও দুইশত টাকা মূল্যের একজোড়া বালা পাঠাইয়াছেন।

নুরল হাসিতে হাসিতে স্ত্রীকে বলিলেন, আপনার গোয়েন্দাগিরির পুরস্কার নিন।

ম্যানেজার সাহেব নুরল এসলামকে চাকরিতে হাজির হইতে ডাকিলেন। নুরল বিনীতভাবে ম্যানেজার সাহেবের নিকট আপাতত ছয়মাসের ছুটি লইয়া বেলগাঁও-এ পাটের ব্যবসা খুলিয়া দিলেন।

৯ ❑ চৌদ্দ তোড়া টাকা

নুরল এসলাম পাটের কারবারে প্রভূত জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত ব্যবসায়ে সত্বর লাভবান হইতে লাগিলেন। উকিল সাহেব লাভ দেখিয়া এককালে সাত হাজার টাকা দোস্তের কারবারে নিয়োগ করিলেন।

আষাঢ় মাসে নূতন পাটের মরশুম আসিল। নুরল এসলাম বদ্ধপরিকর হইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। দেশের ভালো পাট জন্মিবার স্থানগুলি পূর্বেই নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। যথাসময়ে ক্রেতা ও দালাল পাঠাইয়া তত্তবৎ স্থানের পাট খরিদ করিয়া আনিলেন। শ্রাবণ মাসের প্রথমভাগে সাতাশ শত মণ পাট কলিকাতায় চালান দিলেন। নুরল এসলাম টাকার জন্য বেরামপুর কর্মচারী না পাঠাইয়া চার দাঁড়ী পানসি লইয়া স্বয়ং যাত্রা করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, আসিবার সময় মধুপুরে স্ত্রীকে দেখিয়া আসিবেন। বেরামপুর হইতে মধুপুর দশ মাইল মাত্র পশ্চিমে।

নুরল এসলাম নগদ চৌদ্দ হাজার টাকা ও অবশিষ্ট টাকার নোট লইলেন। চৌদ্দ হাজারে চৌদ্দ তোড়া টাকা হইল। নুরল এসলাম সন্ধ্যার পূর্বে টাকা লইয়া মধুপুরে আসিলেন। নৌকা ঘাটে লাগিলে তিনি অবতরণ করিয়া বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নুরল এসলামকে দেখিয়া দাসীরা 'সন্দেশ, সন্দেশ' রবে আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল। একজন বয়স্কা দাসী 'চাঁদ দেখুন' বলিয়া তখনই নুরল এসলামের আচকানের প্রান্ত ধরিল। নুরল এসলাম দেখিলেন, তাহাদের নবজাত শিশু ঘর আলোকিত করিয়া শোভা পাইতেছে। দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। তিনি অন্তঃপুরের সকলকে যথাসাধ্য আপ্যায়িত করিয়া বহির্বাটিতে আসিলেন।

নুরল এসলাম টাকার তোড়াগুলি তাঁহার শ্বশুরের শয়নঘরে হেফাজতে রাখিতে শাশুড়ির নিকট দিলেন।

১০ ❑ এই সুযোগে

গ্রীষ্মাতিশয্যে নুরল এসলাম বহির্বাটির বৈঠকখানায় আসিয়া শয়ন করিলেন। ভূঞা সাহেব শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া মেঝেতে সারি দেওয়া চৌদ্দটি তোড়া দেখিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এগুলিতে কী? কোথা হইতে আসিল?'

স্ত্রী কহিল, 'খুলিয়া দেখ না?' ভূঞা সাহেব একটি তোড়া হাতড়াইয়া কহিলেন, 'এ টাকা কে দিল?'

স্ত্রী কহিল : খোদায় দিয়াছে, জামাই আনিয়াছে। ভূঞা সাহেব তাহার উত্তরে কিছু না বলিয়া পান চাহিয়া শয়ন খাটে উঠিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। ভূঞা সাহেবের শয়নঘরে বাতি জ্বলিতেছে। গোলাপজান অতি সন্তর্পণে তোড়ার মুখ খুলিয়া টাকাগুলি মেঝেতে ঢালিতে লাগিল। এক দুই করিয়া পাঁচতোড়া ঢালা হইল, একগাদা টাকা। তদুপরি আরো দুই তোড়া ঢালিল। স্তূপাকার মুদ্রার চাকচিক্য প্রদীপালোকে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হায়রে রৌপ্য চাকতি!

রাশিকৃত রৌপ্যখণ্ড দীপালোকে ঝকঝক করিতেছে। গোলাপজান একদৃষ্টে তৎপ্রতি চাহিয়া আছে। এত মুদ্রা একসঙ্গে সে কখনও দেখে নাই, আজ দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিতেছে। ইহা ছাড়া আরও এত টাকা পাশেই তোড়াবন্দি রহিয়াছে। সবগুলি টাকা সে নিজস্ব করিয়া লইয়া দেখিবার সংকল্প করিতেছে। হায়! সে তার সাধের সংকল্প চাপিয়া রাখিতে পারিল না। পতিকে কহিল, 'এ টাকাগুলি রাখা যায় না?' পতি চমকিয়া উঠিলেন, 'তুমি বলো কী? তোমার কথা তো বুঝিতেছি না।'

তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন, 'জামাতা বিশ্বাস করিয়া যে টাকা দিয়াছে, তাহা তুমি কেমন করিয়া রাখিবে?'

গোলাপজান কহিল, 'তুমি নামে মরদ, কিন্তু আসলে—'

স্ত্রীর তীব্র বিদ্রূপে ভূঞার মনুষ্যত্ব দুর্বল হইয়া পশুত্ব বাড়িয়া উঠিল। তখন তিনি মোহান্ধ হইয়া কহিলেন, টাকা কী উপায়ে রাখিতে চাও? গোলাপজান বাক্স হইতে এক সুবৃহৎ ছুরি বাহির করিয়া পতিকে দেখাইল। পতির প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু গোলাপজান অসংকোচে ছুরির

ধার পরীক্ষা করিতে লাগিল। ছুরির মুখে কিছু মরিচা ধরিয়াছিল। গোলাপজান খাটের নিচ হইতে একটা নুতন পাতিল বাহির করিয়া তৎপৃষ্ঠে সাবধানে মরিচা তুলিতে লাগিল। মৃৎপাত্রের হৃদয় চিরিয়া চিড়চিড় কিড়কিড় শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল।

এই সময় বিচলিত ভূঞা ভয়াতুর ভাষায় স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছুরি দিয়া কী করিবে?' পতির মুখের দিকে চাহিয়া পিশাচী কহিল, 'এতক্ষণে বুঝ নাই ছুরি দিয়া কী করিব? এই ছুরির সাহায্যে তোমাকে সব টাকা নিজস্বরূপে সিন্দুকে তুলিতে হইবে।' পতি কহিলেন : 'সর্বনাশ, তাহা পারিব না। তোমাকে এই ভীষণ কার্য করিতে নিষেধ করিতেছি। এ দুষ্কার্য অপ্রকাশ থাকিবে না। এই খুনের বদলে আমাদের উভয়কে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে।' স্ত্রী বুক ফুলাইয়া কহিল, 'আমি জাফর বিশ্বাসের কন্যা। আমার কথামতো কাজ করিলে ভূতেও জানিতে পারিবে না, তোমার গায়ে কাঁটার আঁচড়ও লাগিবে না। আমি মনে করিয়াছি এই রাত্রেই এই আপদটাকে শেষ করিয়া টাকাগুলি সিন্দুকে তুলিব। ফয়েজউল্লার বউ মরিয়াছে, তোমার বিধবা মেয়েকে তাহার সহিত বিবাহ দিয়া আমাদের চির আশা পূর্ণ করিব। মেয়েও সুখে থাকিবে, তুমিও এই টাকায় চিরকাল সুখে শুইয়া বসিয়া কাটাইতে পারিবে। এখন বুঝিয়া দেখ, আমি কেমন ফন্দি ঠাওরাইয়াছি।'

এইবার পতি কহিলেন, 'তুমি যাহা করিবে, তাহার সাথী আছি।'

এদিকে ধাত্রী আনোয়ারার উপদেশে পিতার ঘরের বারান্দায় উঠিয়া জানালাপথে সমস্ত দেখিল, সমস্ত শুনিল। অতঃপর আনোয়ারাকে সমস্ত কহিল। শুনিয়া আনোয়ারা হতবুদ্ধি হইয়া কাঁপিতে লাগিল।

শ্রাবণ মাস। সর্বত্র পানি থৈ থৈ করিতেছে। রাত্রি নিঝুম। নীলাকাশে অগণিত প্রদীপ মিটিমিটি করিয়া জ্বলিতেছে। এই সময় গোলাপজান পতিকে সঙ্গে করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার হস্তে তীক্ষ্ণধার উজ্জ্বল অসি। পশ্চাতে পতি। হস্তে দড়ি, কলসি ও ছালা।

পিশাচদম্পতি প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিতেই আনোয়ারা সভয়ে ঘরের প্রদীপ নির্বাপণ করিয়া দিল। তখন সহসা ভীষণ অন্ধকার, যেন গোলাপজানের গতিপথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। গোলাপজান ক্ষণকাল থমকিয়া দাঁড়াইল, আকাশপানে চাহিল। সে ভবিষ্যৎ ভুলিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, বিনা চেষ্টায় চৌদ্দ তোড়া টাকা ঘরে আসিয়াছে; এমন সুযোগে এত সুখ, এত সৌভাগ্য!

গোলাপজান বহির্বাটিতে উপস্থিত হইল। সাবধানে চতুর্দিকে দেখিয়া লইল। স্থির হইল পতি মাথার দিক চাপিয়া ধরিবে, সে জামাইয়ের গলা কাটিবে। তাহারা ধীরে নিঃশব্দে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। ঘর অন্ধকার। গ্রীষ্মাতিশয্যে জামাতা প্রদীপ নির্বাপণ করিয়া শয়ন করিয়াছেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া গোলাপজান থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িল।

পতি অস্ফুটস্বরে কহিলেন, 'বসিলে কেন?'

স্ত্রী : আমার হাত-পা অবশ হইয়া আসিতেছে, বুকের মধ্যে ভয়ানক ব্যথা লাগিতেছে।

পতি : আমারও গা কাঁপিতেছে।

পাপীয়সী অদম্য বাসনাবলে দাঁড়াইয়া দৃঢ়মুষ্টিতে ছুরির বাঁট চাপিয়া ধরিল, পরে শয়নখাটের নিকট আসিয়া সম্মুখভাগ হাতড়াইয়া দেখিল কেহ নাই। শেষপ্রান্তে দেখিল, লোক আছে।

পরীক্ষা করিয়া বুঝিল, লোক গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। তখন বিলম্বমাত্র না করিয়া একই সময় পতি মাথা ঠাসিয়া ধরিল, স্ত্রী সতীন-কন্যা জামাতার গলা কাটিয়া দুই ভাগ করিল।

১১ ❑ আলুলায়িতা উন্মাদিনী

অতঃপর দ্বিখণ্ডিত লাশ ছালায় ভরিয়া কলসির সঙ্গে বাঁধিয়া স্রোতে ডুবাইয়া দেওয়া হইল। গোলাপজান আলো জ্বালিয়া বৈঠকখানার রক্তাদি ধৌত করিল। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত। স্বামী-স্ত্রী ঘরে আসিল। গোলাপজান ঘরে আসিয়া পুনরায় অবসন্নচিত্তে টাকার পার্শ্বে মেঝেতেই বসিয়া পড়িল। তাহার অন্তরাত্মায় ঘোর অশান্তির তুফান। ক্রমে সর্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিল। সে নির্বাক হইয়া পরিশ্রান্ত কলেবরে ক্রমশ ঝিমাইতে ঝিমাইতে টাকার পার্শ্বে তন্দ্রাভিভূতা হইয়া পড়িল। ভূঞা সাহেব ম্রিয়মাণ হইয়া শয়নখাটে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু পাপের বিভীষিকা তন্দ্রাবস্থায় উভয়কে অস্থির করিয়া তুলিল।

ভূঞা সাহেব গ্রামের প্রধান ও পঞ্চায়েত। প্রাতঃকালে কার্যোপলক্ষে অনেক লোক ক্রমে তাহার বাড়িতে সমাগত হইতে লাগিল। চৌকিদার ট্যাক্স আদায়ের সাড়া দেওয়ার হুকুম লইতে আসিল। ভূঞা সাহেব দারুণ অশান্তি উৎকণ্ঠা হৃদয়ে চাপিয়া বাহিরবাড়িতে আসিলেন। এই সময় গ্রামান্তর হইতে কতিপয় ভদ্রলোক প্রয়োজন-বিশেষে নৌকাপথে উপস্থিত হইলেন। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহারা কহিলেন, আমরা আসিবার সময় আপনাদের গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে একটা লাশ দেখিয়া আসিলাম। একটি আমগাছের শিকড়ে আটকাটয়া আছে এবং ছালার ভিতর হইতে পা দেখা যাইতেছে। সদ্য মরিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। থানায় সংবাদ দেওয়া উচিত।

শুনিয়া ভূঞা সাহেবের মুখ দিয়া ধুলা উড়িতে লাগিল। উপস্থিত গ্রামবাসী লাশ দেখিতে চৌকিদারসহ নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল।

কিয়ৎকাল পর ছালায় ভরা সেই লাশ আনিয়া ভূঞা সাহেবের বাহিরবাড়িতে নামানো হইল। খুলিয়া দেখা গেল, গোলাপজানের প্রাণাধিক পুত্র বাদশা। গোলাপজান যখন অন্তঃপুর হইতে শুনিল, কে যেন বাদশাকে খুন করিয়াছে, তখন সে কিয়ৎক্ষণ বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায় নির্বাক ও নিস্পন্দ হইয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ দ্রুতবেগে উন্মত্তার মতো বহির্বাটিতে আসিয়া মৃত পুত্রের নিকট মূর্ছিতা হইয়া পড়িল। ভূঞা সাহেব পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে স্বস্থানে বসিয়া রহিলেন।

শবের চতুর্দিকে সমবেত লোক নীরব ও স্তম্ভিত। এমন সময় গোলাপজান চৈতন্যলাভ করিয়া উন্মত্তভাবে বলিয়া উঠিল : 'সর্বশেষে জামাই আমার ছেলে খুন করিয়া পালাইয়াছে।' এই সময় নুরল এসলাম অগ্রসর হইয়া কহিলেন : 'মাগো, আমি পলায়ন করি নাই, আপনার পুত্রও হত্যা করি নাই। টাকাই বুঝি এ-কাজ করিয়াছে।'

গোলাপজান ভীষণ বিকট কটাক্ষে নুরল এসলামের দিকে চাহিয়া কহিল, 'তুই এখনও বাঁচিয়া আছিস? আর না, আমার সে ছুরি কৈ? তাই দিয়া তোকে এখনি ছেলের সাথী করিতেছি।' এই বলিয়া পুত্রনাশিনী রাক্ষসীর ন্যায়, উন্মত্ত বেশে উন্মত্ত কেশে ছুরি আনিতে অন্দরের দিকে ছুটিল। তাহার গতিরোধে কেহই সাহসী হইল না। আলুলায়িতা উন্মাদিনীর মূর্তি দেখিয়া দাসীগণ অন্তঃপুরে চিৎকার করিয়া উঠিল। আনোয়ারা ঘরে থরথর করিয়া কাঁপিতে

লাগিল। পিশাচী ছুরির জন্য ঘরে উঠিতেই হামিদার পিতা পশ্চাদ্দিক হইতে যাইয়া ঝাপটিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিলেন।

বাদশা গোলাপজানের পূর্বস্বামীর ঔরসজাত পুত্র, নবীন যুবক, স্কুলে পড়ে। এ সকল পাঠক অবগত আছেন। সে রোজ রাত্রিতে প্রতিবাসী, সমবয়সী ও সমপাঠীর বাড়িতে পড়িতে যাইত এবং রাত্রিতে সেইখানেই থাকিত। গতকল্যও গিয়াছিল । কিন্তু অধিক রাত্রিতে শয়নস্থানের অভাবে তাহারা রাত্রিতেই বাদশাকে রাখিয়া গিয়াছিল।

বাদশা সমপাঠীর বাড়ি হইতে অত রাত্রিতে বাড়ি আসিয়া মা-বাপের বিরক্তির ভয়ে নিঃশব্দে বৈঠকখানায় নুরল এসলামের অপরপাশে শয়ন করিয়াছিল।

ধাত্রী যাইয়া যখন নুরল এসলামের হত্যার আয়োজনের কথা আনোয়ারার নিকট বলিল, তখন আনোয়ারা প্রথমে ভীতচিত্তে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। শেষে ধাত্রীকোলে পুত্র রাখিয়া, অসীম সাহসে বহির্বাটিতে যাইয়া স্বামীকে নিঃশব্দে জাগরিত করিল এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তাহার ঘরে লইয়া আসিল। বাদশা যে নুরল এসলামের পাশে যাইয়া শয়ন করিয়াছিল, তাহা নুরল এসলাম বা আনোয়ারা কেহই জানিতে পারে নাই। আনোয়ারা স্বামীকে লইয়া আসিবার অব্যবহিত পরেই গোলাপজান স্বামীসহ বহির্বাটিতে উপস্থিত হয়।

থানায় সংবাদ দেওয়া হইল। দারোগা আসিলেন, নুরল এসলামের জবানবন্দিতে সমস্ত প্রকাশিত হইয়া পড়িল। অপ্রত্যাশিতরূপে পুত্র নিহত হওয়ায় গোলাপজান একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার চিত্তের সমস্ত শক্তি ও হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সে সমস্ত দোষ স্বীকার করিল। লাশসহ আসামিদ্বয়কে মহকুমায় চালান দেওয়া হইল।

তথা হইতে তাহারা দায়রায় সোপর্দ হইল। জজ সাহেব বিচারান্তে হত্যাকারীদ্বয়ের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন।

১২ ❑ সুখে শান্তিতে

ওয়ারিশ সূত্রে আনোয়ারা সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইল। পিতার জোতের মূল্য বিশ হাজার ও অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য পাঁচ হাজার, মোট পঁচিশ হাজার টাকার সম্পত্তি পাইয়া আনোয়ারা তাহা তাহার স্বামীর চরণে উৎসর্গ করিল।

হত্যাকাণ্ডের গোলযোগ কাটিয়া যাওয়ার পর নুরল এসলামের পাটের ব্যবসায়ের লাভ আশানুরূপ হইতে লাগিল। নুরল এসলামের অর্থসাহায্যে গ্রামের দুস্থ লোকগণের সুখসম্ভোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি দরিদ্রলোকের শিক্ষার জন্য স্বগ্রামে অবৈতনিক মাইনর স্কুল খুলিয়া দিলেন।

পূর্বেই মাতার সহিত বিবাদ করিয়া সালেহা কিছুদিন নুরল এসলামের বাড়িতে ছিল। কিন্তু অভিমানিনী মাতা কন্যাকে শাসন করিয়া পরে বাড়িতে লইয়া যান। এখন তাহাদের কখনও অর্ধাহারে কখনও-বা অনাহারে দিন যাইতে লাগিল। সালেহা সময় সময় বিশুষ্ক মুখে চুপে চুপে আনোয়ারার নিকট যায়। আনোয়ারা তাহাকে আদর করিয়া নানাবিধ সুখাদ্য পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দেয়, কাছে বসাইয়া নানাবিধ সুখ-দুঃখের কথা বলে। সালেহার মায়ের খাওয়া-পরার কথা জিজ্ঞাসা করে। সরলা সালেহা মাতার অনাহার বস্ত্রকষ্টের কথা সব খুলিয়া বলে।

একদিন আনোয়ারা স্বামীকে কহিল : আম্মাজানদিগের দিন চলে না, আল্লার ফজলে এখন তোমার সচ্ছল অবস্থা। এ সময়ে তাঁহাদিগকে সাহায্য না-করা বড়ই অন্যায় হইতেছে।

নুরল : কীভাবে সাহায্য করিতে বলো?

আনো : তাঁহাকে পুনরায় এই সংসারে আনিতে চাই।

নুরল : আমি তোমার প্রস্তাবে সুখী ও সম্মত হইলাম।

আনোয়ারা একদিন রাত্রিকালে খোকাকে কোলে লইয়া একজন দাসী সঙ্গে সালেহাদিগের আঙিনায় উপস্থিত হইল; সালেহার মা আনোয়ারাকে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। সালেহা আনোয়ারাকে দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইল। তাড়াতাড়ি খোকাকে কোলে লইয়া সোহাগ করিতে লাগিল। আনোয়ারা শাশুড়ির পদচুম্বন করিয়া কহিল : আম্মাজান, আমার খোকাকে দোয়া করুন।

আনোয়ারার শিষ্টাচারে সালেহার জননীর অন্তর কোমল হইয়া আসিল। সালেহা তাহার মায়ের কোলে ছেলে দিল। মা সাগ্রহে ছেলেকে চুম্বন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। আনোয়ারা কহিল : আম্মাজান, খোকা আপনাকে লইতে আসিয়াছে, আপনি আপনার বাড়িতে চলুন।

অগ্নির উত্তাপে যেমন লৌহ দ্রবীভূত হয়, এবার সালেহার মা সেইরূপ বিগলিত হইলেন। তিনি ভগ্নকণ্ঠে গদগদভাবে কহিলেন : 'খোকার বাপ আমায় পৃথক করিয়া দিয়াছে।' আনোয়ারা দুঃখের স্বরে কহিল : অমন কথা বলিবেন না, সংসার জুড়িয়াই এমন কিছু হয়।

পরদিন পুনরায় আনোয়ারা পুত্র কোলে করিয়া আসিয়া সালেহাসহ তাহার মাতাকে বাড়িতে লইয়া গেল।

আনোয়ারার ব্যবহারে তাহার সৎ-শাশুড়ি আপন মায়ের অধিক হইয়া উঠিলেন।

সুখশান্তিতে নুরল এসলামের সংসার আনন্দময় হইয়া উঠিল।

উপসংহার

শীতকাল। দিবাকর দক্ষিণায়নে দাঁড়াইয়া সহস্ররশ্মি প্রভায় ভুবন আলোকিত করিয়াছে। রতনদিয়ার গ্রামের একটি দ্বিতল অট্টালিকার নির্জন চত্বরে একজন যুবতী প্রাতস্নানান্তে সুমসৃণ কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া সোনার আল্‌নায় চুল শুকাইতেছে। একটি শিশু তাহার সম্মুখে সৌধদ্বারে দাঁড়াইয়া তুর্কি অশ্বে আরোহণ নিমিত্ত বারংবার চেষ্টা করিতেছে। এই সময় একখানি পত্রহস্তে একজন যুবক নিচের সিঁড়ি বাহিয়া ওপরে উঠিতেই যুবতীকে তদবস্থায় দেখিয়া থামিয়া গেলেন এবং ঈষৎ অন্তরালে থাকিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। যুবতীর সুলম্বিত ঘনকৃষ্ণ কুন্তলরাশি সোনার আলনায় সুধীর প্রভাত সমীরণে ইতস্তত মৃদুমন্দ সঞ্চালিত হইতেছিল। মেঘের কোলে ক্ষণপ্রভার অপরূপ শোভা অনেকেই দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু রামধন্য কোলে স্থিরা সৌদামিনীর মোহন মাধুরী কি কেহ কখন দেখিয়াছেন? যুবক অতৃপ্তনয়নে যুবতীর এই অদৃষ্টপূর্ব ভুবনভুলানো রূপলাবণ্য দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ যুবতীর দৃষ্টি যুবকের উপর পতিত হইবামাত্র যুবতী সলাজ সংকোচে হাসিমুখে মাথায় ঘোমটা টানিয়া আসন হইতে উত্থিত হইল এবং কহিল : এখন না-আসিলে কি চলিত না?

যুবক : তুমি এত দুষ্ট হইলে কবে?

যুবতী : এ তো দুষ্টামির কথা নয়। ঢিলটি ছুড়িলে পাটকেলটি খাইতে হয়।

যুবক : রক্ষা কর, আর পাটকেল টাটকেল ছুড়ো না। একটু অবজ্ঞার ঢিলা দিয়া জেলের গুঁতানি খাইয়া আসিয়াছি।

যুবতী : তোমার মিলাদের আয়োজন কতদূর?

যুবক : উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে নাকি?

যুবতী : সে কী কথা।

যুবক : মিলাদ আমার না তোমার?

যুবতী : যারই হোক, আয়োজন কতদূর?

যুবক : এ তো শুধু মিলাদ নয়, রাজসূয় উৎসব। এ উৎসবের বিধি-বন্দোবস্ত করা ক্ষুদ্র মাথায় কুলাইতেছে না।

যুবতী : মাথা খাটাইয়া ফর্দ করিয়াছ। এখন তদ্দৃষ্টে বন্দোবস্ত করা বেশি কঠিন কি।

যুবক : এত মওলানা, মৌলবী সাহেবানের আনা-নেওয়া, দেশসুদ্ধ লোকের আহারাদির বন্দোবস্ত করা কি সহজ ব্যাপার?

যুবতী : আমার দাদিমা বলিয়াছিলেন, দাদামিঞা মক্কাশরিফ যাইবার পূর্বে একমণ হরিদ্রার আয়োজনে গরিব-ভোজনের মহোৎসব সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। এ ব্যাপারে ১০-১২ সের হরিদ্রা ব্যয় হইবে, এরই বন্দোবস্তে অক্ষম হইতেছ? দাদিমার মুখে আরও শুনিয়াছি, ঈমানের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইলে দয়াময় আল্লাহতায়ালা নিশ্চয় লোকের মকছেদ পুরা করিয়া থাকেন। আমিও জানি সৎকার্যে খোদা সহায়।

যুবক : তোমাদের দাদি–নাতিনীর কথা অভ্রান্ত ও শিরোধার্য। দয়াময় খোদা এ পর্যন্ত আমার সব নেকবাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। তবে সে বাসনা ভিন্নরূপ।

যুবক : প্রথমে তোমাকে পাইবার বাসনা। দ্বিতীয় স্বাধীন ব্যবসায়ে জীবিকা নির্বাহ করা, তৃতীয় তোমার চুল শুকানোর নিমিত্ত সোনার আলনা ও চাঁদির কুরসি প্রস্তুত করিয়া দেওয়া।

যুবতী : চাঁদির কুরসি তো পাই নাই।

যুবক : ফরমাইশ দিয়াছি।

যুবতী : কবে পাইব?

যুবক : মিলাদের দিন।

যুবতী : চাঁদির কুরসির কথায় আমার একটি স্বপ্নের কথা মনে পড়িল।

যুবক : শুনিতে পাই না?

যুবতী : যেদিন রুপার কুরসিতে বসব সেইদিন বলব।

যুবক : আমারও একটি কথা স্মরণ হইল।

যুবতী : (অধরে হাসি লইয়া) বলিবে না?

যুবক : (স্মিতমুখে) যেদিন তুমি স্বপ্নের কথা বলিবে সেইদিন আমার কথাও শুনিতে পাইবে।

যথাসময়ে নুরল এসলামের বাড়িতে মসজিদ মিলাদের ধুম পড়িয়া গেল। রাজসূয় উৎসবের বিবরণ লিখিয়া পাঠক–পাঠিকাগণকে আর বিরক্ত করিতে চাহি না। তবে আপনারা জানিয়া রাখুন, আনোয়ারা এই ব্যাপারে যে ১০–১২ সের হরিদ্রা ব্যয়ের অনুমান করিয়াছিল, তাহার স্থলে অর্ধমণ হরিদ্রা খরচ হইল। রতনদিয়ার চতুষ্পার্শ্বস্থ দশ–বারো গ্রামের লোক, বেলগাঁও বন্দরের যাবতীয় হিন্দু–মুসলমান, স্বয়ং জুটের ম্যানেজার সাহেব এই মহামিলাদে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত রবাহূত, অনাহূত অগণিত লোক এই মহোৎসবে উপস্থিত হইয়াছিল।

মিলাদের দিন আনোয়ারা রজতাসন পাইয়াছে। মিলাদশরিফ সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার পরদিন স্নানান্তে দ্বিতল বাসগৃহের সেই নির্জন চত্বরে পরমানন্দে সেই রুপার কুরসিতে বসিয়া সোনার আলনায় পূর্ববৎ চুল শুকাইতেছে। এমন সময় নুরল এসলাম তথায় আসিয়া কহিলেন : 'রুপোর কুরসিতে তো বসিয়াছ, এখন তোমার স্বপ্নের কথাটা শুনা যাক।' আনোয়ারা সহাস্যে কহিল : যদি নাছোড় হও তবে শোন।

নুরল একখানি আসন টানিয়া লইয়া স্ত্রীর সম্মুখে বসিলেন।

আনোয়ারা বলিতে লাগিল : 'অনেক দিনের কথা, ভালোরূপ মনে নাই, তবে যাহা মনে আছে, তাহাই বলিতেছি। স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম আমি যেন একটি ক্ষুদ্র নদীতীরে বসিয়া আছি। নদীর পরপারে নীলাকাশে চাঁদ উঠিয়া ক্রমে যেন আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেছি, সহসা অদূরে বুলবুলের প্রাণ মাতানো সঙ্গীতের ন্যায় এক সুমধুর রব আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। স্থিরচিত্তে শুনিয়া বুঝিলাম, কে যেন অদৃশ্যে থাকিয়া কোরান পাঠ করিতেছে। শেষে সেই স্বরে আবার এক বিশ্বপ্রেমভরা মোনাজাত শুনিতে পাইলাম। আমার মনে হইল, আমি তৎপূর্বে ওরূপ ভক্তিভাবপূর্ণ মোনাজাত ও কোরান পাঠ কোথাও কখনও শুনি নাই। তাই আত্মহারা হইয়া শুনিতে লাগিলাম।

কিয়ৎকাল পর আবার স্বপ্নবশেই দেখিলাম একজন সুন্দর যুবক করুণদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে দেখিবামাত্র লজ্জিত হইয়া উঠিয়া যেন পলায়ন করিলাম। অল্পকাল পরে দেখিলাম, কে যেন আমার হাত-পা বাঁধিয়া দুর্গন্ধময় কূপে নিক্ষেপের চেষ্টা করিতেছে। এই সময় আবার আকাশের গায়ে মেঘ সাজিল, ঝড়-তুফান ক্রমে প্রলয়কাণ্ড ঘটাইয়া তুলিল। মেঘের গর্জনে বিজুলির চমকে জীবজন্তু সব অস্থির হইয়া উঠিল। সর্বত্র দাউদাউ করিয়া আগুন জ্বলিতে লাগিল। আমি ভয়ে চিৎকার করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে সব থামিয়া গেল। শেষে দেখিলাম, এই—বলিয়া আনোয়ারা থামিয়া গেল।

নুরল : এই কী?

আনো : (ভ্রূকুটিসহকারে) আরও ভাঙিয়া বলিতে হইবে?

নুরল : এমন স্বপ্ন কি আর ইশারা করিয়া বলিলে চলে।

আনো : আমি দোমহলা দালানে রুপার কুরসিতে বসিয়া সোনার আলনায় চুল শুকাইতেছি। আর পূর্বে যে-যুবককে দেখিয়া লজ্জায় পলাইয়াছিলাম, তিনি আমাকে যেন কী বলিতেছেন।

এই পর্যন্ত বলিতেই আনোয়ারার রক্তিমাভ মুখমণ্ডলে তাহার সুখ তরঙ্গায়িত হৃদয়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল। নুরল এসলাম পুনরায় হাসিয়া কহিলেন : 'যুবক তোমাকে কী বলিয়াছিলেন?' আনোয়ারা বিলোলকটাক্ষে কহিল, 'অত দিনের কথা মনে নাই।'

নুরল : আমি বলিতে পারি।

আনো : বলো দেখি।

নুরল : যুবক বলিয়াছিলেন, 'প্রেমময়ী প্রেমের ছলে রেখো দাসে চরণতলে।'

আনোয়ারা আসন হইতে উঠিয়া নুরল এসলামের মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল : তোমার পায়ে পড়ি, অমন মনগড়া কথা বলিলে আমি আর তোমাকে কোনো কথা বলিব না।

নুরল স্ত্রীকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া কহিলেন : আচ্ছা আমি আর কিছু বলিব না। তোমার মনগড়া সুন্দর স্বপ্নের কথাই শোনা যাউক।

আনো : কিছুদিন পরে বাপজান দুর্গন্ধকূপে নিক্ষেপের ন্যায় নীচবংশে আমার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। বিবাহের লগ্নদিনে সত্যই ঝড়তুফান হইল, বাজ পড়িয়া আমাদের গোশালায় আগুন লাগিল। স্বপ্নের শেষ ফল, এই দেখ দেখ, রুপার খাটে বসিয়া সোনার আলনায় চুল শুকাইতেছি, আর সেই দু—

নুরল : আচ্ছা, নৌকার ওপরে সেই দুষ্ট যুবককে দেখিয়া সাধ্বী কুলবালার মনে কিছু উদয় হইয়াছিল না?

আনো : কী আর মনে হইবে? দেখিয়া তাজ্জব হইয়াছিল।

নুরল : আর কিছু নয়?

আনোয়ারা ফাঁপরে পড়িয়া স্বামীর মুখে প্রেমতীব্র কটাক্ষ হানিল।

নুরল : সত্য কথা না-বলিলে ছাড়িব না। মেয়েলোকে পুরুষের দোষই বেশি দেখে।

আনোয়ারা চুল গোছাইয়া পলায়নে উদ্যত হইল। নুরল ধাঁ করিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

আনো : ছাড়ো, সবাই আড়ি পাতিয়া দেখিবে।

নুরল : হাসিতেছ কেন?

আনো : পেটের কথা টানিয়া বাহির করিতে জানো।

নুরল : কোন কথা?

আনো : যে, কথা এতক্ষণ চাপিয়া আসিতেছিলাম, তোমার প্রশ্নের উত্তরেই তাহা বলিতে হইতেছে।

নুরল : বেশ, তবে বলো।

আনো : আচ্ছা, তবে শোনো, সেই প্রথমদিন তোমাকে নৌকার ওপরে দেখিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশকালে অস্ফুটস্বরে হৃদয়ের সহিত বলিয়াছিলাম—মা, তোমার কথা যেন সত্যে পরিণত হয়। আমি একমাস নফল রোজা করিব। ফল লাভ করিয়া ফিরানীতে মধুপুর গিয়া সেই মানত শোধ করিয়াছি।

নুরল : তাহা তো দেখিয়াছি, কিন্তু লক্ষ টাকার জান বাঁচাইয়া তাহার পুরস্কার তো পাই নাই।

আনো : কেন? যাহা যত্ন করিয়া রক্ষা করিয়াছি, তাহা সমস্তই তোমাকে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নুরল : সে তো মূলধন, কিছু উপরি লাভ কই?

আনোয়ারা কী যেন মনে করিয়া 'আজ দিব' বলিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

তবে 'এখনই দাও' বলিয়া নুরল সোৎসাহে মস্তক অবনত করিলেন। আনোয়ারা বিদ্যুদ্বেগে নিজ মস্তক উত্তোলন করিয়া 'তবে এই নাও' বলিয়া হাসিতে হাসিতে সাদরে স্বামীর মুখচুম্বন করিয়া মধুর উপরি লাভ প্রদান করিল।

শব্দার্থ ও টীকা টিপ্পনী

অবৈতনিক মাইনর স্কুল	শিশুদের জন্য বিনা বেতনের বিদ্যালয়।
আগুল্‌ফলম্বিত	গোড়ালি পর্যন্ত।
আচকান	লম্বা একধরনের পাঞ্জাবি আকারের পোশাক।
আকবরি পোলাও	একধরনের উত্তমমানের সুস্বাদু পোলাও, যে-পোলাও মোগল বাদশাহ আকবর পছন্দ করতেন। তাঁর আমলে এরকম পোলাও রান্না চালু হয়েছে।
আলাহিদা	আলাদা।
উৎসন্ন, উচ্ছন্ন	বিনষ্ট, বিধ্বস্ত, অধঃপতিত।
এন্ট্রান্স	ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা, মাধ্যমিক পরীক্ষা।
এজমালি	সর্বজনীন, উত্তরাধিকারদের জন্য অবিভাজ্য স্থাবর সম্পত্তি।
এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন	সহকারী অস্ত্রোপচারকারী ডাক্তার, সহকারী বড় ডাক্তার।
ওমরাহ	উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, আমির-এর বহুবচন।
কন্থার ঝুলি	কাঁথা দিয়ে তৈরি ভিক্ষার ঝুলি।
কাবিন	(ফারসি) মুসলমান স্বামী বিবাহকালে স্ত্রীকে যে-অর্থ দিতে অঙ্গীকার করে, দেনমোহর।
কুশলাদি	মঙ্গল, কল্যাণ।
কলাগাছের মতো মেয়ে	যে মেয়ে দেখতে লম্বা।
ক্যাশ-কামরা	যে সুরক্ষিত ঘরে টাকা রাখা হয়।
কাবেল	(আরবি শব্দ) যোগ্যতাসম্পন্ন, উপযুক্ত, লায়েক, গুণবান।
কাজা	বকেয়া (কাজা নামাজ)। সময়ে যা করা হল না পরে সে বকেয়া কাজ শেষ করা।
কোর্মা	ঘি-দধি দিয়ে রান্না মাংস বা গোশতের তরকারি।
খাসি-মোরগ	বেশ বড় মোরগ। এসব মোরগের পুরুষশক্তি ছিন্ন করা থাকে।
ক্ষয়কাশ	যক্ষ্মারোগ, কাশির সঙ্গে মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে এই রোগে।
গোলেস্তা	কবি শেখ সাদীর বিখ্যাত গ্রন্থ।
গালপাট্টা বান্ধা	গালে রুমাল বাঁধা। সেই সময় সাধারণ পুলিশরা রুমাল এমনভাবে বাঁধত যে তাতে গাল ঢেকে থাকত।
গরিবখানায়	বাড়িতে (বিনয় করে নিজের বাড়িকে গরিবের বাড়ি বলা)।
ঘরজামাই	যে মেয়ের জামাই শ্বশুরবাড়িতেই থাকে। এরকম জামাই সমাজের চোখে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত নয়।
ছৈ-ঘেরা	নৌকার ওপর বসার জায়গাটুকু বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়। তাকেই ছৈ-ঘেরা নৌকা বলা হয়।

ছয় পেটি	ছয় বান্ডিল।
জবেহ	জবাই (পশু জবাই)
জিয়াফত	দাওয়াত, আমন্ত্রণ জানানো।
জেলায় চালান দিব	জেলা শহরে পাঠাব, আসামিকে সদরে পাঠানো।
জায়নামাজ	যে মাদুর বা কাপড়ের ওপর দাঁড়িয়ে বা বসে নামাজ আদায় করা হয়।
জেয়াদা	বেশি।
জীব-সঞ্চার-ব্রত	অসুস্থ বা মৃতমানুষের দেহে বল বা জীবন আনার জন্য সাধনা।
ঝঞ্ঝাবাত	প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি।
ঠাকুরুণ	সম্মানিতা মহিলা (যেমন ছেলের বউ-এর কাছে শাশুড়ি সম্মানিতা)।
ডোরাছিটের	লম্বা রেখাযুক্ত ছাপা কাপড়।
ডেকচি	বড় হাঁড়ি।
তাহে তাহে	তাকে তাকে।
তছরুপ	ক্ষতি, চুরি, আত্মসাৎকরণ।
তোড়াবন্দি	মুদ্রাপূর্ণ থলি।
তসবি	(আরবি) মুসলমানি জপমালা, আল্লার নাম বা দোয়া-দরুদ পাঠ করে তসবির গুটি গোনা।
তাহাজ্জদের নামাজ	বিশেষ পুণ্যলাভের জন্য গভীর রাতে যে নামাজ পড়া হয়।
তিলককাটা	দেহে অঙ্কিত চন্দন বা তিলক মাটির চিহ্ন, বৈষ্ণবরা এরূপ করে থাকে।
তালুক	জমি-জায়গা সরকার বা জমিদারের নিকট থেকে বন্দোবস্ত করে নেয়া, ভূসম্পত্তি।
দুর্গা	হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান দেবী। (এখানে একজন মেয়ের নাম)।
দারান্তর	অন্য বিবাহ করা।
দোরস্ত	(ফারসি শব্দ) শায়েস্তা করা, সোজা করে দেওয়া, সুশৃঙ্খল করে দেওয়া।
দেওয়ান সাহেব	রাজস্ব আদায়কারী, সম্মানিত ব্যক্তি।
দাঁত লাগিয়েছে	অজ্ঞান হয়েছে।
দায়রা জজ	(আরবি) ফৌজদারি উচ্চআদালতের বিচারক, সেশন জজ।
দুই রাকাত শোকরানা নামাজ	মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দুই রাকাত নামাজ।
দস্তুরি	(ফারসি) প্রথাগত, নিয়ম বা রীতি অনুসারে।
ধ্রুবন্তরী	অব্যর্থ।
নামাবলি	হরিনাম (শ্রীকৃষ্ণ) ছাপযুক্ত গায়ে দেওয়ার চাদর।
নবদ্বীপ	চৈতন্যদেবের জন্মস্থান এবং বৈষ্ণবদের মূল স্থান। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর অঞ্চল।
নফল	(আরবি শব্দ) বাধ্যতামূলক নয় কিন্তু মঙ্গল কামনার জন্য যে

	নামাজ আদায় করা হয়।
নীহারসিক্ত	বরফভেজা, তুষারভেজা।
নাশতা	সকালের খাবার।
নওশা	বর।
পিকদান	পানের পিক ফেলার বাসন।
পাঁচ গণ্ডা	কুড়িটা।
পীর মোরশেদ	আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য সম্মানিত ব্যক্তি।
পালের বড় গরুটা	বেশ কয়েকটি গরুর মধ্যে যে-গরুটি বড়।
পেটকাটা ছৈ	যে নৌকার ছৈ-এর মাঝখানে জানালা কাটা আছে।
পাঠান	আফগান থেকে আগত জনসম্প্রদায়।
ফুরশি	তলা-চওড়া হুঁকা, গড়গড়া।
ফাতেমা জোহরা	হযরত মুহম্মদ (স.)-এর কন্যা বিবি ফাতেমা (রা.) সম্পর্কিত।
বেতস বন	বেতগাছের বন।
বৈষ্ণবী	বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী রমণী। এরা আখড়ায় থাকে। ভিক্ষা করে অন্ন সংগ্রহ করে এবং নামকীর্তন করে।
বরকত	সৌভাগ্য, প্রাচুর্য, কল্যাণপ্রদ শক্তি।
বড়ে দিয়া দাবা মারিয়া	দাবা খেলায় সাধারণ সিপাহি দিয়ে রাজাকে মারা।
বাচলামি	বাচাল, যে বেশি কথা বলে।
ভুইমালি	ঝাড়ুদার।
ভাণ্ডার ঘর	যে ঘরে চাল-ডাল ইত্যাদি জমা রাখা হয়।
ভেদবমি	কলেরা রোগজনিত লক্ষণসমূহ।
ভৌমিক	জমির মালিক, একপ্রকার উপাধি বিশেষ।
মোসাম্মাৎ	(আরবি শব্দ) মুসলিম মেয়ের নামের আগে ব্যবহৃত সম্মানসূচক শব্দ।
মগরেবের নামাজ	সন্ধ্যাবেলার নামাজ।
মোঘল	সম্রাট বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজক্ষমতা। তুর্কিস্থান থেকে আগত জাতি বিশেষ। এঁরা মুসলমান।
যাচনদার	যে যাচাই করে।
যমদ্বার	মৃত্যুর দুয়ার।
রেঙ্গুন	বার্মাদেশের রাজধানী। (একসময় বাংলাদেশের বহুলোক রেঙ্গুনে যেত চাকরি ও ব্যবসার জন্য।)
রবিবারে অফিস বন্ধ	সেই সময় অফিস ছুটি থাকত রবিবারে।
রুমি টুপি	তুরস্ক দেশের একধরনের লাল রঙের টোপরের মতো উঁচু এবং ঝালরসহ টুপি। এই টুপি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ জালালুদ্দীন রুমি এই টুপি ব্যবহার করতেন।
রেঙ্গুনের লুঙ্গি	রেঙ্গুনের তৈরি রঙিন ও শৌখিন লুঙ্গি।
রাকাত	(আরবি) প্রতি নামাজের সংখ্যা নির্ধারণ পদ্ধতি।

শামাদান	মোমবাতি রাখার জন্য দণ্ড।
শেরেক	আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাস না-করে বহুবাদে বিশ্বাস করা।
শানবাঁধা	ইঁট দিয়ে বাঁধা।
শ্যাক	শেক, সেখ।
শরিয়ত	(আরবি) মুসলমানি ধর্ম-আচার ও সামাজিক আচার।
ল-ক্লাস	আইনবিষয়ক লেখাপড়া।
ষোড়শোপচার	পূজার জন্য ষোলোপ্রকার উপকরণ।
সান্নিপাতিক	টাইফয়েড জ্বর, পিত্ত, কফ ইত্যাদি অসুখ।
সিঁথির সিঁদুর অক্ষয়	বিবাহিত হিন্দুরমণীকে আশীর্বাদ করা—যেন সে বিধবা না-হয়। তার স্বামী বেঁচে থাকলে তার মাথার সিঁদুর অক্ষয় থাকবে। এখানে আনোয়ারা সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেন তার স্বামী বেঁচে থাকে।
সিজিল মিছিল	সুশৃঙ্খল।
সাধা বিবাহ	যেখানে বরকে সাদরে ডেকে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়।
সম্বন্ধী	স্ত্রীর বড় ভাই।
সক্রেটিস	গ্রিকদেশীয় দার্শনিক। খ্রিস্টজন্মের প্রায় ৪৭০ বছর পূর্বে জন্ম। তিনি সত্যরক্ষার জন্য বিষপান করে আত্মদান করেছিলেন।
হযরতের জীবনচরিত	হযরত মুহম্মদ (স.)-এর জীবনী।
হরিনাম	যিনি সকল মানুষের হৃদয় হরণ করেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র।
হাজত	বিচারের পূর্বে কারাগারে বাস করাকে হাজতবাস বলে।
হ্যান্ডনোট	টাকা ধার নেওয়ার সময় লিখে দেওয়া অঙ্গীকার।
হেবা করা	(আরবি শব্দ) সমস্ত সম্পত্তি অপরকে লিখে দেওয়া; ইসলামি শাস্ত্রমতে দানবিশেষ।

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি **'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'**র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

9841800 90X404